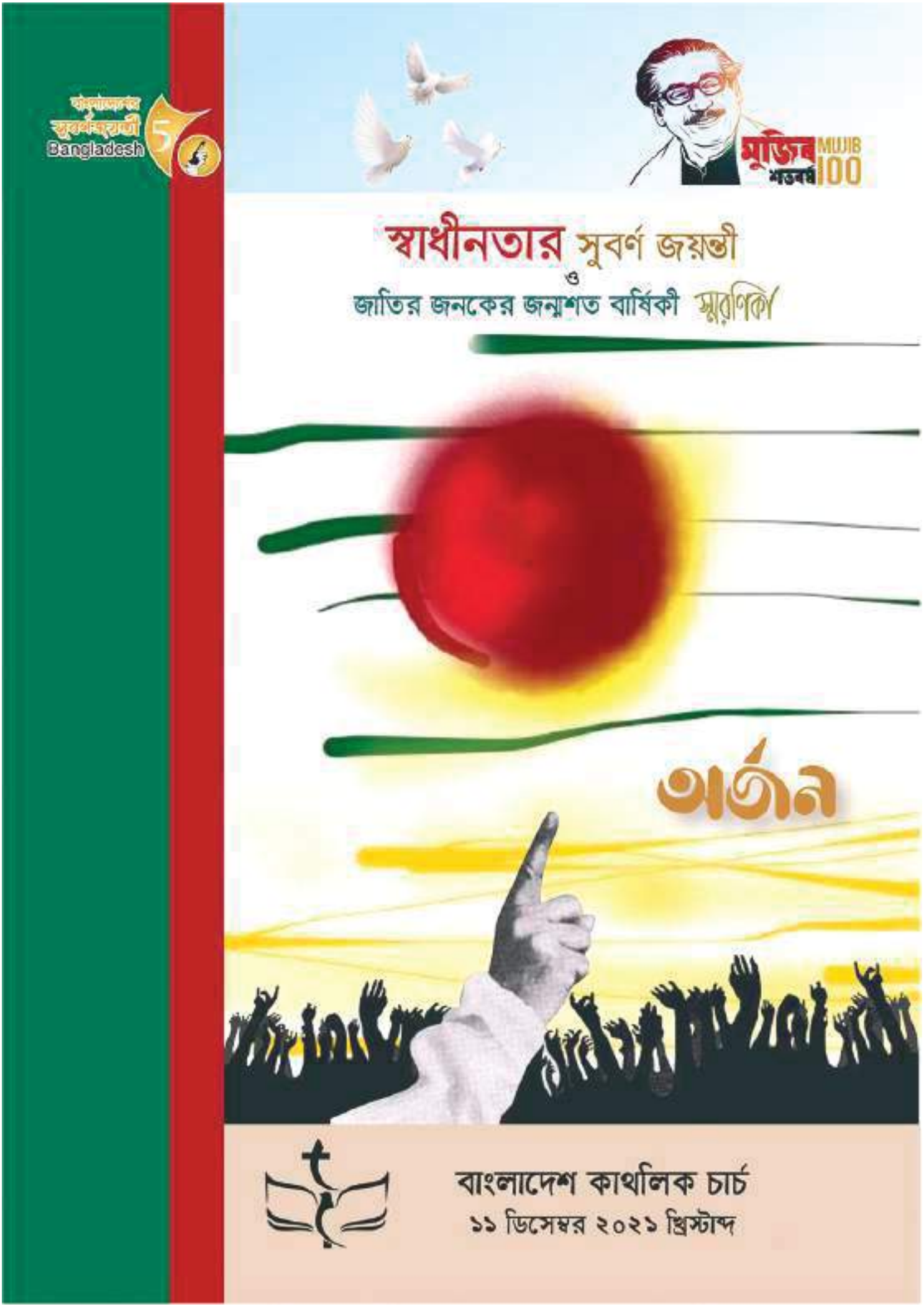

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী
Bangladesh 50

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী
ও
জাতির জনকের জন্মশত বার্ষিকী স্মরণিকা

অর্জন

বাংলাদেশ কাথলিক চার্চ

১১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

ফাদারকে বিদ্ধ করে । গুলির পূর্ব মুহূর্তে ফাদার কী যেন বলতে চেয়েছিলেন তা আর বলা হল না । সে সুযোগ সৈন্যরা তাঁকে আর দিল না । ওপরে দু'হাত তোলা অবস্থায়ই তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন । ফাদারের বয়স তখন ৫৮ বছর । পিপাসা নিবারণের জন্য ফাদার বাবুর্চিখানায় গিয়েছিলেন । ফাদারের পিপাসা আর নিবারণ হলো না, অমৃতলোকের ভোজসভায় অংশগ্রহণের জন্য চিরদিনের জন্য তিনি ধরাধাম ত্যাগ করেন ।

ফাদার মারিও'র সঙ্গে স্বপন পল বিশ্বাস নামে আরো এক যুবক সেখানে ছিল । পাকসেনাদের গুলিতে সেও ফাদারের সঙ্গে অমৃতলোকের সঙ্গী হয় । সৈন্যেরা বাবুর্চিখানার মধ্যে প্রবেশ করেনি ফলে সন্তোষ বাবুর্চি সে যাত্রা রক্ষা পায় । ফাদার ভেরোনেসি ও স্বপনকে হত্যা করার পর আরো পাঁচজন যশোরবাসী একই সময় নিহত হয় । ফাদার মারিওকে কোন প্রকারে বাবুর্চিখানা সংলগ্ন হাসপাতালের পার্শ্বে সমাধিস্থ করা হয় । পরে তার দেহাবশেষ শিমুলিয়া গীর্জা প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয় ।

ফাদার মারিও ভেরোনেসি বানিয়ারচর ও ভবরপাড়াতে বেশ কয়েক বছর কাজ করেছিলেন । তবে তাঁর প্রিয় গ্রাম শিমুলিয়ার মত কোন গ্রাম তার হৃদয়কে এতটা স্পর্শ করতে পারে নি । তিনি শিমুলিয়াকে যেমন ভালবেসেছিলেন তেমনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাদের জন্য পরিশ্রমও করেছিলেন । নিয়তির কী খেলা, তার মৃতদেহটি শেষ পর্যন্ত শিমুলিয়াতেই রাখা হয় । আজো অনেক মানুষ এই মানুষটিকে স্মরণ করে তার সমাধি স্থলে এসে দু'দণ্ড প্রার্থনা করে যায় ।

অমর শহীদ ফাদার লুকাস মারান্ডি :

পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যদের নির্মম অত্যাচারের স্বীকার হয়ে যখন হাজার হাজার বাঙ্গালী ভারতের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন জেলার শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিতে শুরু করে তখন ফাদার মারান্ডি'র কাছে খবর আসে যে দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের ৪টি কাথলিক মিশন থেকেও খৃষ্টভক্তগণ এলাকা ছেড়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করছে । এমন কি রুহিয়া এলাকা থেকে বহু মানুষ তাদের বাড়ি-ঘর ত্যাগ করে ভারতে পলায়ন করছে । তাঁর ধর্মপল্লীবাসী খৃষ্টভক্তগণ তাঁকে ধর্মপল্লী ত্যাগ করে তাদের সাথে পালিয়ে যেতে অনুরোধ করেন । অবশেষে ফাদার মারান্ডি ধর্মপল্লী ছেড়ে যেতে সিদ্ধান্ত নেন । তিনি মিশনের গরুর গাড়ীতে মিশনের প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও তাঁর ব্যক্তিগত জিনিসপত্র চাপিয়ে প্রায় ৬ কি.মি. দূরে সীমান্তবর্তী নাগর নদীর তীরে যেতে বলেন । তিনি নিজে মটর সাইকেল যোগে নদী তীরে পৌছান । যখন তার গরুর গাড়ীটি নদী তীরে পৌছে তখন তিনি নিজেও গরুর গাড়ীসহ স্যালো নদী পাড়ি দিয়ে ভারত সীমান্তে পৌছান । ওপার থেকে তিনি পিছন দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবেন । তাঁর সহযোগীরা বিস্মিত মনে অপেক্ষা করতে থাকে । তখন তার সঙ্গীরা তাকে ভারতের দিকে অগ্রসর হওয়ার অনুরোধ জানালে তিনি তাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলেন, আমাদের ভুল হয়েছে । চলো আমরা রুহিয়াতে ফিরে যাই । তখন তিনি আবার নদী পাড় হয়ে ধর্মপল্লীর দিকে ফেরত রওনা করেন । মিশনে এসে ফাদার লুকাস মারান্ডি একাই ধর্মপল্লীতে থাকা শুরু করেন । মিশনের কাছাকাছি শুধুমাত্র কয়েকজন খ্রিষ্টভক্ত বসবাস করছিল । ২১ এপ্রিল দুপুর ১২টা । পাকিস্তানি হানাদার সেনাবাহিনীর একটি সাঁজোয়া গাড়ী এসে থামে ঠাকুরগাঁওয়ের রুহিয়া ক্যাথলিক মিশনের সামনে । ফাদার লুকাস মারান্ডি চা-বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়ন করেন সেনাদের । তারা মিশনে তল্লাশি করে সন্দেহভাজন কাউকে না পেয়ে চলে যায় । ঘন্টা তিনেক পর তারা আবার মিশনে এসে ফাদারকে বের করে এনে, বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে । অভিযোগ, ফাদার মুক্তিযোদ্ধাদের মিশনে আশ্রয় দিতেন । ওরা বেয়নেটের আঘাতে তার মুখমন্ডল বিকৃত করে ফেলে । চারদিকের দেয়ালে তাঁর রক্ত ছিটকে পড়ে । এরপর তারা ফাদারকে মৃত ভেবে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে । কাছাকাছি বসবাসরত কয়েকজন কাথলিক খৃষ্টভক্ত ফাদারের এই মৃতপ্রায় অবস্থা দেখে তারা তাকে সেই গরুর গাড়ীতে তুলে ভারতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে । কিন্তু পথেই ফাদার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন । তাঁর মৃতদেহ ভারতের সীমান্তের ওপারে ইসলামপুর ক্যাথলিক গির্জায় সমাহিত করা হয় । মরণাপন্ন অবস্থায় আহত ফাদারকে মিশন বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিছু লুটেরা গির্জাঘর ও ফাদারের থাকার বাড়ি তছনছ করে সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যায় ।

রুহিয়া ধর্মপল্লীতে ফাদার লুকাস মারান্ডির হত্যা ঘটনা বর্ণনায় ফাদার হারুন হেমরম তার 'শহীদ ফাদার লুকাস মারান্ডি' বইতে লিখেন- ১২ এপ্রিল ১৯৭১ পুণ্য বুধবারে ফাঃ লুকাস নিজপাড়া মিশনে ফাঃ কভাএার সাথে দেখা করতে যান । উদ্দেশ্য ছিল দু'টি । প্রথমতঃ পবিত্র সপ্তাহে নিজে পাপস্বীকার করা; দ্বিতীয়তঃ তাঁর ডিস্পেনসারীর জন্য কিছু ঔষধ আনা । নিজপাড়া মিশন শিলিগুড়ি থেকে বেশী দূরে নয় । বর্ডার খোলা । এই সুযোগে তিনি ভারতের গায়াডাঙ্গা মিশনে যেতে চান । ফাঃ কাভাএা কিন্তু সম্মতি দিতে ইতস্ততঃ করছিলেন কারণ দেশের অবস্থা তখন মোটেই ভাল ছিল না । তিনি পাস্কা পর্বের পরই গায়াডাঙ্গা মিশনে যান । ভারতের ইসলামপুর মিশনে থাকাকালিন তিনি জানতে পারেন দেশের অশান্তির কথা এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কিভাবে অসহায়, নিরিহ মানুষদের ওপর নির্মমভাবে অত্যাচার, নির্যাতন শুরু করেছে সেই সব লোমহর্ষক খবর । তিনি তখন ভাবেন একজন পুরোহিত হিসাবে তার দায়িত্ব এখনই তাঁর মিশনে ফিরে গিয়ে খ্রীষ্টভক্তদের পাশে দাঁড়ানো । এই হতাশা নিরাশার সময়ে এবং এই অজানা বিপদের দিনে তাদেরকে একা ফেলে রাখবেন না । তাঁর হৃদয় পিতৃ করুণায় ভরে উঠে । তাই তিনি সিদ্ধান্ত নেন মিশনে তাঁর ফিরে যাওয়া যে জীবনের বিরাট ঝুঁকি তাও তিনি গ্রাহ্য করেন নি । তিনি প্রস্তুত হন রুহিয়াতে ফিরে আসতে । কিন্তু ইসলামপুরের ফাদারগণ তাঁকে ফিরতে নিষেধ করেন । তাঁরা তাঁকে বলেন, তিনি যদি এ সময় রুহিয়াতে যান তাঁর জীবন বিপন্ন হবার ভয় রয়েছে । তিনি কিন্তু ভাবেন পাকিস্তানি সৈন্যরা তাঁকে কিছু করবে না কারণ তিনি পুরোহিত এবং তিনি দরিদ্রদের রক্ষা করার জন্য সেখানে আছেন ।

এদিকে রুহিয়ার খ্রিষ্টানরা সকলে জীবনের ভয়ে ভারতে পালাতে শুরু করে। এমন সময় তিনি ভারত থেকে ফিরে আসেন। কিন্তু এমন বিপদের দিনে কোন কাজেই তিনি এখানে কারো সাহায্য সহযোগিতা পান নি। এরই মধ্যে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। কিছু দুর্বৃত্ত ও পাকিস্তানি দালাল মিলিটারীর কাছে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক নালিশ করে যেন তাঁকে হত্যা করা হয়। পিউশ দরেকান্ত দাস একবার তাঁকে বলেন -*ফাদার, সকলে ভারতে চলে যাচ্ছে, আমাদের এখানে থাকা আর কোন ক্রমেই নিরাপদ নয়।* ফাদার উত্তর দেন -*কেন তুমি এতো ভয় পাচ্ছো ? ওরা যদি মারে তবে আমাকে মারবে, তোমাকে নয়।*

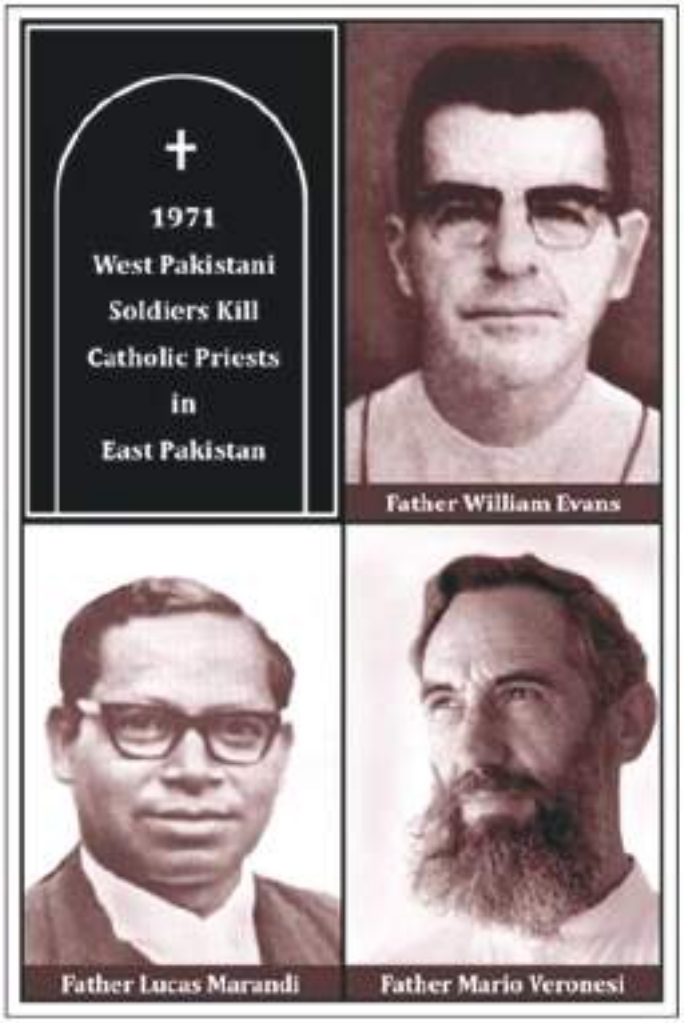

২১ এপ্রিল। পিউশ দরেকান্ত দাস তাঁকে বলেন, *ফাদার মিশনের জন্য কোন টাকা নাই।* সেই সময় ব্যাংক থেকে টাকা তোলা সম্ভব ছিল না। দরেকান্ত মিশনের ধান চাল বিক্রি করে কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার কথা বলে। এই সব কথা আলাপের পর সে বাড়ি চলে যায়। বারটার দিকে হঠাৎ মিলিটারির ভ্যান সড়ক বেয়ে রুহিয়ার বাজারের দিকে ছুটে যায়। কয়েক মিনিট পর আবার ফিরে এসে মিশনের গেটের কাছে থামে। চারজন সৈন্য গাড়ি থেকে নামে এবং ফাদারের কাছে যায়। তারা বলে "*আমরা আপনার বাড়ি দেখতে চাই, সেখানে কি আছে।*" ফাদার তাদেরকে অফিস ঘরে, খাবার ঘরে ও শোবার ঘরে নিয়ে যান। তারা সন্দেহ করছিল এখানে কোন মুক্তিযোদ্ধ থাকতে পারে। ফাদার তাঁর বাবুর্চি সহিস দাসকে ডেকে তাঁদের জন্য চা প্রস্তুত করতে বলেন। বাবুর্চি জিজ্ঞেস করে "*ফাদার কতজনের চা?*" সেই সময় দরজায় একজন সৈন্য দাড়িয়ে ছিল। বাবুর্চির জিজ্ঞাসা শেষ হবার সাথে সাথে তাকে খুব জোরে একটা চড় মারে। বাবুর্চি প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়। ফাদার লুকাশ তাঁর স্নান ঘরের দরজার কাছে দাড়িয়ে ছিলেন। সৈন্যদের মধ্য থেকে একজন হঠাৎ ফাদারকে গুলি করে। গুলিটি তাঁর কান ভেদ করে বেরিয়ে যায়। ফাদার মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাঁর ক্ষত হতে রক্তের স্রোত বইতে থাকে। বাবুর্চি সহিস তখন লুকিয়ে ছিল। কিছুক্ষণ পর মিশনে ফিরে এসে ফাদারকে দেখে সে হতভম্ব হয়ে পড়ে। ঈশ্বরের মনোনীত যাজক, রুহিয়ার পালক রক্তাক্ত মুমূর্ষু অবস্থায় মাটিতে পড়ে রয়েছেন! দরেকান্ত এবং আরো কয়েকজন খ্রিষ্টভক্ত তাঁর ক্ষত বেঁধে দেয় এবং মহিষের গাড়ী করে ইসলামপুরে যাওয়ায় পথেই তিনি মারা যান। বিকাল ২টার দিকে দরেকান্ত দাস, বীরজ পিটার দাস, যোসেফ দাস এবং সহিস দাস মৃতদেহ নিয়ে সমস্যায় পড়ে। মরাগাটি ক্যাম্পের বি.এস.এফ-রা মৃতদেহ নিয়ে ভারতে প্রবেশ করতে দিচ্ছিল না। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর তাদের ভারতে নিয়ে যেতে দেয়। তারা মধ্য রাতে ইসলামপুরে পৌঁছে। সেখানকার ফাদারগণ ও জনগণ ফাদারের মৃত দেহকে ভক্তি সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন। জয় বাংলার যাজক ফাদার লুকাস মারান্ডী শহীদ হয়েছেন। তিনি আপনজনদের জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। এই সংবাদ শুনে দলে দলে মানুষ তাঁর মৃতদেহ এক নজর দেখার জন্য আসতে থাকে। ইসলামপুরে তাঁর মৃতদেহ যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে সমাহিত করা হয়।

ফাদার লুকাসের জন্ম :

নওগাঁর ধামইরহাট উপজেলার বেনীদুয়ার গ্রামের একটি মধ্যবিত্ত সাঁওতাল পরিবারে ১৯২২ সালের ৪ আগষ্ট তাঁর জন্ম। বাবা মাথিয়াস মারান্ডিও ছিলেন ধর্মপ্রচারক। মা মারিয়া কিস্কু গৃহিনী। দুই ভাইয়ের মধ্যে তিনি বড়। লুকাশ মারান্ডির শিক্ষাজীবন শুরু বেনীদুয়ার মিশন স্কুলে। পরে তিনি দিনাজপুর সেন্ট ফিলিপস হাইস্কুল ও দিনাজপুর জিলা স্কুল থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ের পড়াশোনা শেষ করে উচ্চশিক্ষার জন্য ভারতের বিহারের রাঁচি সেমিনারি ও ভেল্লোর সেমিনারিতে ভর্তি হন। দর্শনশাস্ত্রে

তিনি উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষা গ্রহন শেষে ১৯৫৩ সালে যাজকপদে অভিষিক্ত হন। তাঁর কর্মজীবন শুরু মারীয়পুর ধর্মপল্লীতে। পরে তিনি দিনাজপুরের সেন্ট ফিলিপস হাইস্কুলের ছাত্রাবাসের পরিচালক নিযুক্ত হন। এখানে তিনি সেন্ট যোসেফস সেমিনারির আধ্যাত্মিক পরিচালক এবং পরে বেনীদুয়ার মিশনে ধর্মপ্রচারকদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষক ও পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। একাত্তরে তিনি ভারতীয় সীমান্তের নিকটবর্তী ঠাকুরগাঁওয়ের রুহিয়া কাথলিক মিশনে পালকের দায়িত্ব পালন করেন।

ফাদার লুকাসের অবদানঃ

ফাদার লুকাস মারান্ডি জীবনের পুরোটা সময় মানুষের সেবা ও ধর্মীয় শিক্ষাদান করেছেন। ফাদার লুকাসের অকাল মৃত্যু মণ্ডলীর জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। সেই সময় এক মাত্র তিনিই দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের দেশীয় যাজক ছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট সাওতাল পন্ডিত ছিলেন। তিনি সাওতালী ভাষায় উপাসনাদি প্রস্তুতির কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। উপাসনার জন্য বই এবং গানের বই (Seven Puthi) প্রস্তুতির কাজে জড়িত ছিলেন। তিনি সাঁওতালী ভাষার লেখক ছিলেন। সেই সময় ভুমকার (ভারতের সাঁওতাল পরগনা) সাঁওতালী পত্রিকা "মারশাল তাবোন"-এ সহযোগিতা করেছেন। এছাড়াও অন্যান্য প্রকাশনার কাজেও সহযোগিতায় ছিলেন। সাঁওতালী ধর্ম প্রশিক্ষক হিসেবে তাঁর চাহিদা ছিল। সর্বোপরি তিনি পালকীয় সম্প্রদায়ের একজন নেতা ছিলেন। তাঁর আঠার বছরের পুরোহিত জীবনের পালকীয় অভিজ্ঞতা অনেক বেশী ছিল।

ফাঃ লুকাস মারীয়ামপুরে ফাঃ লুইজি ফুকাতোর সাথে এক মন প্রাণ হয়ে একে অপরের সাহায্য-সহযোগিতায় অবিচল থেকে কাজ করে যাচ্ছিলেন। তিনি গভীর ভক্তি-বিশ্বাস সহকারে সমস্ত মন-অন্তর-শক্তি ও জীবন দিয়ে তাঁর পালকীয় কাজ করতেন। সেই সময় মফস্বলে কাজ করা খুব কষ্টকর ছিল। তিনি নিজের জীবন তুচ্ছ করে গ্রামে যেতেন। তিনি খ্রিষ্টানদের গ্রামগুলো সব সময় পরিদর্শন ও পালকীয় কাজের জন্য যেতেন। রোদ বৃষ্টি বাদল কিছুই মানতেন না।

ফাদার লুকাস ছিলেন একজন দক্ষ পরিচালক ও নেতা। সেই সময় রুহিয়া এলাকায় চোর ডাকাতের ভয় ছিল। সেখানে নতুন ও অল্প সংখ্যক খ্রিষ্টান বাস করত। ৭০টির মত গ্রামে খ্রিষ্টানরা অনেক দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। তারা ছিল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ও খুবই গরীব। তাঁর আমলে দুই একটি গ্রামে গীর্জা ঘর ছিল। তাদের থাকার ঘর ছিল ছোট ছোট আর জঙ্গা। ঐসব গ্রামে গিয়ে অনেক কষ্টে তিনি তাদের সাথে থাকতেন। তাঁর বিশ্বাস খুব গভীর ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন এদের জন্য যীশু এসেছিলেন। সেইজন্য তাদের প্রতি তাঁর প্রেম ছিল অগাধ। উত্তম মেষপালকের মত তিনি তার মেষদের জন্য সর্বদা চিন্তিত ছিলেন। তাদের দেখাশোনা ও পরিচর্যার জন্য তিনি সদাব্যস্ত থাকতেন। বিভিন্ন গ্রামে যেতেন। তাদের দুঃখ দুদর্শা দেখে তিনি দুঃখ পেতেন। তাদের দুঃখ কষ্টের শরীক হতেন। যতদূর পারতেন তিনি সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতেন। তিনি উত্তম ফসল, নেতা ও পরিচালক প্রস্তুত করার জন্য রুহিয়াতে ছোট ছেলেদের জন্য একটি ছোট বোর্ডিং শুরু করেন। তাঁর স্মরণে এ পর্যন্ত বিভিন্ন সংঘ সমিতি স্কুল প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয়েছে। শহীদ ফাদার লুকাশ মারন্ডীর স্মরণে কারিতাসের মাধ্যমে একটি রাস্তা দিনাজপুর বিশপস্ হাউসের দক্ষিণে অবস্থিত মসজিদ সম্মুখ থেকে পূর্বে পুলহাট বড় রাস্তা পর্যন্ত মাটি দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল। এখন এটা সুন্দর পাকা রাস্তা হয়েছে। রুহিয়া মিশনে তাঁর স্মৃতি সৌধ নির্মার্ণ করা হয়েছে এবং তাঁর স্মরণে 'শহীদ ফাদার লুকাশ মারন্ডী প্রাথমিক বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ঠাকুরগাঁও-এ 'শহীদ ফাদার লুকাশ মারন্ডী ট্রেড স্কুল' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ ছাড়াও গত ১৯৮৯ সালে ফাদার হারুনের প্রচেষ্টায় 'শহীদ ফাদার লুকাশ মারান্ডী শিক্ষা তহবিল' গঠন করা হয়েছে। এই তহবিল থেকে অসহায় ও দরিদ্রদের শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হয়। ফাদার লুকাস স্মরণে নওগাঁর ধামইরহাটের বেনীদুয়ার মিশনে নির্মিত হয়েছে স্মৃতিফলক।

তথ্যসূত্রঃ

1. ***'Father Evans, CSC, Missioner and Martyr'*** by Fr. Alfred D' Alonza, CSC

   Holy Cross Fathers' Achieve US Province, Indiana.

2. **স্মরণিকা**, পবিত্র জপমালা রাণীর গির্জা, শিমুলিয়া ধর্মপল্লীর ।
3. একাত্তরে দিনাজপুর ও শহীদ যাজকগণ, সিলভানো গোরেল্লো।
4. মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের পেছনে ছিল দেশ-বিদেশের বহু মানুষের একক ও মিলিত প্রচেষ্টা। প্রথম আলোর ধারাবাহিক প্রকাশনা ২৯.০৯.২০২১ খ্রিঃ, পৃষ্টা ১৬।

(লেখক: অ্যাসোসিয়েস মিলন থান ১০ জুলাই ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ সমাজ বিজ্ঞানে গবেষণা ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ৩৫ বছর আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন সংস্থায় মিডিয়া কমিউনিকেশন বিভাগে চাকরি করে বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছেন। তিনি একজন লেখক ও প্রকাশক।)

মুক্তির রণাঙ্গনে চার্চ কর্তৃক শরণার্থীদের আশ্রয় ও সেবাদান

ফাদার আদম এস. পেরেরা, সিএসসি

খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা চার্চকে বাংলায় বলে খ্রিষ্টমণ্ডলী বা প্রায়শঃই কেবল মণ্ডলী। মানব সেবার মাধ্যমে স্রষ্টার সেবার উপর চার্চ বা খ্রিষ্টমণ্ডলী সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যিশু খ্রিষ্ট নিজের বিষয়ে বলেন, "মানবপুত্র তো সেবা পাবার জন্য আসে নি; সে এসেছে সেবা করতে এবং বহু মানুষের মুক্তিপণ হিসাবে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে" (মার্ক ১০:৪৫)। মানবসেবার বিষয়ে তাঁর উক্তি হলো: "আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে জল দিয়েছিলে; বিদেশী ছিলাম, দিয়েছিলে আশ্রয়; ছিলাম বস্ত্রহীন, তোমরা আমাকে পোশাক পরিয়েছিলে; আমি পীড়িত ছিলাম, তোমরা আমার যত্ন নিয়েছিলে; ছিলাম কারারুদ্ধ আর তোমরা আমাকে দেখতে এসেছিলে" (মথি ২৫:৩৫-৩৬)। খ্রিষ্টের আদলে চার্চের নেতৃবর্গ এবং তৎসঙ্গে খ্রিষ্টভক্তগণও মানব সেবাতে আনন্দের পরশ পেয়ে থাকেন। এ কারণেই মণ্ডলীর ইতিহাসে দেখা গেছে, অগণিত ঐশসান্নিধ্য-পিপাসু মানুষ নিজ নিজ বসতবাড়ি, আত্মীয়-স্বজন, সুখ-সম্পদ--সকলই পরিত্যাগ করে চলে গেছেন পৃথিবীর দুর্গমতম স্থানে, এমনকি সবচেয়ে বিপদজনক পরিবেশে; আর নতুন নতুন প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে নির্দ্বিধায় মানবসেবায় ব্রতী হয়েছেন। এতে দিগ্-দিগন্তে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছে হাজার হাজার সেবাপ্রতিষ্ঠান। চার্চের এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই বাংলাদেশের খ্রিষ্টভক্তেরা মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেছিল এবং যুদ্ধের পরে দেশের পুনর্গঠন ও ঘরবাড়ি, সহায়-সম্পদ, আর স্বজন হারানো মানুষের পুনর্বাসনে কাজ করেছে, বিনিয়োগ করেছে অর্থসম্পদ।

চার্চ এবং খ্রিষ্টভক্তরা মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে সাংগঠনিকভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবেও। তাঁদের একদিকে অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে সশস্ত্রভাবে মুক্তিযুদ্ধ করে, অন্য দিকে মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদেরকে আশ্রয় ও সেবা দিয়ে, এবং সৃষ্টিকর্তার কাছে দিনরাত প্রার্থনা ক'রে। বাংলাদেশের খ্রিষ্টানগণ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে শরণার্থীদেরকে আশ্রয় ও সেবা দিয়েছেন ধর্মপল্লীতে বা পরিবারে, এবং ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য দিয়েছেন নানাবিধ ছোট-খাট বা বড় পরিসরে। যে এলাকাগুলোতে পাক-বাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতন ভয়ংকর রূপ নিয়েছিল সেসব এলাকার প্যারিশে ও খ্রিষ্টান পাড়াগুলোতে শরণার্থীদের পরিমাণও অধিক ছিল বলে আশ্রয় দেওয়া ও সেবা করার পরিমাণও ঐ এলাকাগুলোতে ছিল অধিক। ২৫ মার্চের কাল রাতে পাক-বাহিনী যাকে সামনে দেখেছে তাকেই গুলি করে হত্যা করতে শুরু করেছিল, কিন্তু পরে তারা হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ইত্যাদি করেছে প্রধানতঃ হিন্দু জনগোষ্ঠির উপর, যেখানে মুক্তিযোদ্ধা আছে বলে রাজাকারদের কাছ থেকে পাকিস্তানীরা খবর পেয়েছে সেইসব এলাকার লোকদের উপর (এই ক্ষেত্রে কোন ধর্মানুসারী প্রাধান্য পায়নি), এবং যারা 'দেশদ্রোহী' ও মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছে বলে তারা খবর পেতো তাদের উপর। এসব কারণে পাকবাহিনী ও রাজাকারদের হাতে নিঃস্ব হয়ে, কেউ কেউ আবার প্রিয়জন হারিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ চলে গিয়েছিল হয় ভারতে না হয় এ দেশেই কোন না কোন নিরাপদ স্থানে। খ্রিষ্টানদের পরিবার বা চার্চ কম্পাউন্ডকে ঐ নির্যাতিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষদের অনেকেই বেশি নিরাপদ মনে করতো কারণ প্রথমদিকে পাক-বাহিনী খ্রিষ্টানদেরকে অত্যাচার-নির্যাতন করেনি। এ কারণে এইসব এলাকায় হিন্দু জনগণ বেশি আশ্রয় নিয়েছিল। চার্চের কর্তৃপক্ষ এবং খ্রিষ্টান মানুষেরাও পাকবাহিনীর কাছে শরণার্থীদেরকে নিজেদের মানুষ বলেই পরিচয় করিয়ে দিতো। মক্তিযুদ্ধের এই বিভীষিকাময় দিনগুলোতে চার্চ শরণার্থীদেরকে আশ্রয় ও সেবা দিয়ে কী ভূমিকা করেছে তার মাত্র কিছু অংশ নিচে তুলে ধরলাম।

১। নাগরী সেন্ট নিকোলাস প্যারিশ: ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় শরণার্থীদেরকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আশ্রয় ও সেবা দিয়েছিল নাগরী প্যারিশ। এই প্যারিশে তখন প্রধান পুরোহিত ছিলেন আমেরিকান নাগরিক ফাদার এডমন্ড গেভার্ট, সিএসসি এবং তাঁর সহকারী ছিলেন আর এক আমেরিকান, ফাদার ফ্রান্সিস উইস, সিএসসি। উভয়েই আমেরিকান সেনাবাহিনীর সদস্য হিসাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে দুজনেই বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, ঘরবাড়ি সবকিছুর মায়ামমতা ছেড়ে দিয়ে চলে যান সেমিনারীতে। হলি ক্রস সংঘভুক্ত যাজক হিসাবে তাঁরা এসেছিলেন তৎকালীন পূর্ববঙ্গে মানব সেবায় জীবনের বাকী দিনগুলো কাটিয়ে দিতে। তাঁদের সাথে নাগরীতে আরও ছিলেন করাচীর খ্রিষ্টরাজা সেমিনারীতে অধ্যয়ন করে দেশে ফিরে সদ্য অভিষিক্ত হওয়া ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা, সিএসসি। করাচীতে থাকার সুবাদে তিনি উর্দুভাষাও রপ্ত করেছিলেন। বিভিন্ন দিক দিয়ে অভিজ্ঞ এই তিনজন পুরোহিতদের পাশাপাশি ঈশ্বরপ্রেমিক সেবক-সেবিকারূপে ছিলেন প্যারিশের কাথলিক খ্রিষ্টভক্তগণও। কাজেই সকলের সক্রিয় সহযোগিতায় শরণার্থীদের বিপদের সময়কার এই কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে তাঁরা অনেক সাহস সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন।

১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ২৫ বছরের রজত জয়ন্তী পালনের স্মরণিকায় ফাদার এডমন্ড গেডার্ট-এর লেখা ও ফাদার আদম পেরেরা'র বাংলা অনুবাদ "বাংলাদেশ ১৯৭১-১৯৯৬" নামক প্রবন্ধে এই এলাকার জনগণের উপর পাকিস্তানীদের নৃশংস হত্যা ও নির্যাতনের চমৎকার বিবরণ রয়েছে। রাঙ্গামাটিয়া প্যারিশের উত্তর দিকে অবস্থিত হিন্দু অধ্যুষিত বাইরা গ্রামে ১৪ মে তারিখে সংঘটিত নির্মম হত্যাকাণ্ড-পরবর্তী ঘটনাবলি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:

ঐ দিন এই গ্রামের সকলেই যার যার কাজে ব্যস্ত ছিল। শিশুরাও খেলাধুলার আনন্দে মেতে উঠেছিল। কিন্তু অকস্মাৎ পাক-বাহিনী হত্যাকাণ্ড শুরু করে। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই মেশিনগানের এলোপাতারি গুলির শব্দে আর গুলিবিদ্ধ মহিলা ও শিশুদের আর্তচিৎকারে শান্ত-সৌম্য পাড়া গাঁ ফেটে পড়লো। বুকের শিশুদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরে এবং বাকীগুলোকে সামনে নিয়ে মায়েরা দৌড়াতে থাকে জীবনে বাঁচার জন্য। কিন্তু শেষ রক্ষাটিও হলো না। পাষাণ-হৃদয় পাক-বাহিনী তাদের পিছু ধাওয়া করে আর সবগুলোকে গুলি করে ধরাশায়ী করে ফেলে। নিষ্পাপ শিশুগুলোও মায়ের বুক জড়িয়ে ধরেই নিহত হয়। এক মা গুলি খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো ভূমিতে, অন্য এক মা কুড়িয়ে নিল তার পড়ে থাকা আর্তনাদরত শিশুটিকে। কিন্তু বেশিদূর অগ্রসর হতে পারলো না, মেশিনগানের গুলিতে সে নিজেও লুটিয়ে পড়লো ধরার বুকে। ঘটনাস্থলে সেদিন নিহত হয়েছিল মোট ৫৪জন। ঠিক যেন কসাইয়ের মতই কাজ সমাপ্ত করে হানাদার বাহিনী লুট করে নিল দীনদরিদ্র জেলে-কৃষকদের সামান্য সঞ্চয়টুকুও। তারপর পুরো গ্রামটিতে লাগিয়ে দিল আগুন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের ২৫ বছর পরেও লিখতে বসে ফাদার গেডার্টের স্মৃতিপটে ভেসে উঠছিল সেই চিত্রগুলো। তিনি স্পষ্ট মনে করতে পেরেছেন, কীভাবে ইতিহাসের জঘন্যতম ঐ রাতে বাইরা গ্রামের লোকেরা আহতদেরকে বহন করে নিয়ে স্রোতের মত ছুটে এসেছিলো নাগরী প্যারিশে; সেখানে আশ্রয় চাইলো এই বিপদগ্রস্ত মানুষগুলো। মানবসেবায় ব্রতী ফাদারেরা প্যারিশের স্কুলঘর শরণার্থীদের জন্য খুলে দিলেন। পরের দিন দেখা গেল আরও হাজার হাজার শরণার্থী এসে সেখানে জড়ো হলো। মুহূর্তেই দশ হাজার শরণার্থীর ভিড়ে নাগরী প্যারিশের প্রাঙ্গণ ছেয়ে গেল। চার হাজারের মত মানুষ ঠাসাঠাসি করে আশ্রয় নিয়েছিল স্কুলঘরগুলোতে। বাদবাকীদেরকে প্যারিশের হৃদয়বান খ্রিষ্টান মানুষেরা নিয়ে গেল নিজ নিজ পরিবারে। প্রায় সব পরিবারই কোন না কোন শরণার্থী-পরিবারকে আশ্রয় দিল। ফাদার গেডার্টের ভাষায় 'এই দৃশ্য সেদিন সকলকেই মুগ্ধ করেছিল'।

ফাদার গেডার্টের ভাষায়, প্রথম দিকে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী তাদের সন্ত্রাসের রাজত্ব সব বাঙালীর বিরুদ্ধেই চালিয়েছিল, কিন্তু ছয় সপ্তা অবধি বাছবিচারহীন হত্যাকাণ্ড চালানোর পর তাদের কাছে ঐ পদ্ধতি নিষ্ফল বলে বোধগম্য হলো। তাদের বর্বর শক্তির বিরুদ্ধে ঘরে ঘরে গড়ে উঠলো প্রতিরোধ শক্তি আর জোরদার হয়ে উঠলো স্বাধীনতা আন্দোলন। কে বা কারা সত্যিকারের আওয়ামী লীগ নেতা তাতে কোন গুরুত্ব না দিয়ে সামরিক জান্তারা এবার ধরে নিল যে হিন্দুরাই দেশ বিভাগ আন্দোলনের প্রধান দুষ্কৃতকারী কারণ হিন্দুপ্রধান দেশ হিসাবে ভারত আওয়ামী লীগকে সরাসরি সাহায্য করছিল আন্দোলন চালিয়ে যেতে। এদিকে নাগরী প্যারিশ প্রধানত: হিন্দুদেরকে আশ্রয় দিয়েছিল বলে পাকিস্তান সরকার প্যারিশের ফাদারদেরকেও সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করলো। এই অবস্থায় নাগরীর ফাদার ও অন্যান্য নেতৃবর্গকে কী দুর্বিষহ অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল তা ফাদার গেডার্টের লেখায় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে:

সেদিন থেকে আমরা দুর্বিষহ এক ভীতির মধ্যে দিনাতিপাত করতে লাগলাম কারণ এক রাতের মধ্যে আমরা হয়ে গেলাম সরকারের শত্রু। সেনাবাহিনী আদেশ দিলো যেন আমরা শরণার্থীদেরকে তাড়িয়ে দিই এবং যদি তা না করি তবে এর সমুচিত জবাব তারা আমাদের দিবে বলে হুমকি দিয়ে গেল। এর মধ্যে তারা বিশপকেও জড়ালো এবং আমাদের এই বলে হুশিয়ার করে দিয়ে গেল যে, আমরা নাকি দেশের শত্রু পালন করছি। তারা একটা হেলিকপ্টার পাঠিয়ে দিল যেন ট্যাংকের তেল তলানিতে না যাওয়া পর্যন্ত সেটা যেন আমাদের মাথার ওপর অবিরাম চক্কর দিতে থাকে। পাকবাহিনীর হুমকির পাশাপাশি আমাদের কাঁধের ওপর স্থাপিত হলো অগণিত লোকের জন্য অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান আর চিকিৎসা যোগানোর দুর্বিষহ বোঝা; এর সঙ্গে পাহাড় সমান ময়লা নিষ্কাশনের সমস্যা তো রইলোই।

পাক-বাহিনীর হুমকি সত্ত্বেও নাগরী প্যারেশের ফাদারগণ ভীত হননি। ফাদারদের সাথে সিষ্টারগণ এবং গ্রামের নেতৃবর্গ সহ সকলেই সহযোগিতা করেছেন। বিশেষত: স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক আলম মাস্টার, ভিনসেন্ট রড্রিক্স মাস্টার ও যেরোম রড্রিক্স লোকদের পরিচালনা করার ব্যাপারে প্রচুর সহায়তা করেছেন। আহতদেরকে সেবা দিয়ে সুস্থ করে তুলেছিলেন নিকটবর্তী ডিসপেন্সারীর এসএমআরএ সংঘের সিষ্টারগণ ও বাজারের অধীর নামক এক সমাজসেবক কম্পাউন্ডার। হাজার হাজার লোককে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত খাওয়ানো ও লেখাপড়ার জন্য অজস্র টাকা-পয়সার দরকার ছিল। ফাদার গেডার্ট এই কাজে আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন কাথলিক চার্চের সদ্য সংগঠিত কোর (CORR) এবং আমেরিকান সাহায্য সংস্থা সিআরএস (কাথলিক রিলিফ সার্ভিস) থেকে। ফাদার গেডার্ট তাঁদের কাছে চিঠিপত্র পাঠাতেন বিদেশীদের হাতে এবং ঢাকা থেকে তাঁরা বেশ কয়েকবার তাঁকে টাকা পাঠিয়েছেন নানারকম অদ্ভুতপূর্ব পদ্ধতিতে--গুড়া দুধের বস্তার ভিতরে অথবা ত্রাণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত পচাগলা লক্কড়ভরা বস্তার মাঝখানে, যেন কেউ সেই বস্তা ধরতেও ঘৃণাবোধ করে। ঐসব টাকা দিয়ে খাদ্য কিনে ফাদারগণ শরণার্থীদের কাছে রুটি, আলু, গম, চাল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিতরণ করতেন। এভাবে ১০,০০০ মানুষকে সাত মাসেরও বেশি সময় বাঁচিয়ে রেখেছেন।

পাকিস্তানী সেনা অফিসাররা মাঝে মাঝে নাগরী প্যারিশে টহল দিতে আসলে ফাদার গেভার্ট নিজেই তাদের ঘুরাতেন আর বলতেন 'এই সবই আমার লোক, এখানে কোন হিন্দু নেই'। একবার কিছু পাকিস্তানী প্যারিশেরই একটা গ্রামে এসে হাজির হলো। ভীতসন্ত্রস্ত লোকেরা দৌড়ে গেল প্যারিশে, ফাদারদেরকে খবর দিতে। ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা, সিএসসি ক্যাসাক পরিহিত অবস্থায় গেলেন ঐ পাক হানাদারদের সামনে। পাকিস্তানী সামরিক জান্তারা বন্দুক উঁচিয়েছিল তাঁর দিকে। কিন্তু সব বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন আর উর্দু ভাষায় তাদেরকে বুঝালেন যে ঐ লোকেরা সব খ্রিষ্টান এবং সকলেই দেশের বন্ধু, কোন শত্রু সেখানে নেই।

২। **রাঙ্গামাটিয়া প্যারিশ:** ভাওয়াল এলাকার ৬টি গ্রাম নিয়ে রাঙামাটিয়া যীশুর পবিত্র হৃদয় কাথলিক প্যারিশ স্থাপিত হয় ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এই প্যারিশের পালক পুরোহিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ফাদার চার্লস হাউসার, সিএসসি। এক একান্ত সাক্ষাৎকারে রাঙ্গামাটিয়া সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন বর্তমান (২০২১) পালকপুরোহিত ফাদার খোকন গমেজ ও এই প্যারিশেরই কৃতি সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা বার্ণার্ড রিবেরো, বীর মুক্তিযোদ্ধা অতুল কস্তা, ও বীর মুক্তিযোদ্ধা পাত্রাসিয়াস পালমা, এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্যারিশ পরিচালিত স্কুলের শিক্ষিকা উষা কস্তা ও তাঁর বোন সাধনা কস্তা। তাঁদের ভাষ্য অনুসারে বাইরা গ্রামের জনগণ ১৪ই মে তারিখে দলে দলে এসে উপস্থিত হয়েছিলো রাঙ্গামাটিয়া প্যারিশ ও বিভিন্ন পরিবারে। তারা সাথে করে বহন করে এনেছিলেন অগণিত আহতদেরকেও। কিন্তু ওখানে রেল লাইনের কাছে নিজেদেরকে বেশি নিরাপদ মনে না করে তারা আহতদের চিকিৎসার জন্য চলে গেল নাগরী প্যারিশে। আহত ছিল না এমন বহু মানুষ রাঙ্গামাটিয়ার পরিবারগুলোতে রয়ে গেল। শরণার্থী হিসাবে ঐ লোকেরা রাঙামাটিয়ায় ছিল এক মাসেরও বেশি। সাধারণ মানুষের উপর পাকিস্তানী জান্তাদের এমন জঘন্য অমানুষিক হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচার দেখে রাঙ্গামাটিয়া প্যারিশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খ্রিষ্টভক্ত মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে চলে গিয়েছিলেন ভারতের আগরতলায়। কেউ কেউ পালিয়ে, কেউ কেউ আবার বাবাকে বা মাকে জানিয়ে। বীর মুক্তিযোদ্ধারা নিজেরা বর্ণনা করে বলেছেন যে, তাঁরা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ দ্বারা ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাই তাঁরা দেশের জন্য জীবন দিয়ে যুদ্ধ করতে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু আগরতলায় বিভিন্ন ব্যক্তি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আপনারা যুদ্ধ করবেন? আপনারা তো খ্রিষ্টান! বিদেশী! কেন যুদ্ধ করবেন?" উত্তরে তাঁরা বলেছিলেন, "না আমরা মোটেও বিদেশী নই। আমরা বাংলাদেশী। আমরা অবশ্যই যুদ্ধ করব। আমরা আমাদের মাতৃভূমিকে স্বাধীন করব।" এভাবে তাঁরা প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে আসলেন, নিজ নিজ এলাকায় আত্মগোপনে থেকেই তাঁরা গেরিলা আক্রমণ করতে থাকেন। তাঁরা রেল লাইন উপড়ে নিয়ে বিলের ধানক্ষেতে ফেলে দেওয়া, বিদ্যুতের লাইন কেটে দেওয়া, মাঝে মাঝে দুই একটা গুলি করা ইত্যাদি ভাবে পাকবাহিনীকে জানান দিতেন যে, মুক্তিবাহিনী এদিকে আছে। একবার তাঁরা নলছাটার ব্রিজটা উড়িয়ে দিলেন। এসব ঘটনার পরে পাকবাহিনী ওখানে গিয়ে রাঙ্গামাটিয়ার গ্রামগুলোতে আক্রমণ শুরু করে ১৯৭১-এর ২৬ নভেম্বর। ভয়ে তাঁরা দিকবিদিক ছুটাছুটি করতে থাকেন, গ্রাম ছেড়ে পালাতে থাকেন। বেশ কিছু মানুষ পালাতে পারেন নি। পাক হানাদারেরা সেদিন ঐ প্যারিশের মোট ১৪ জনকে গুলি করে হত্যা করেছিল। প্যারিশের কবরস্থানে তাদেরকে পরের দিন কবরস্থ করা হয়েছিল। ফাদার খোকনের অফিসে গিয়ে দেখা যায়, সেদিনকার নিহত ১৪ জনের নাম খাতায় রেকর্ড করা আছে। এই ঘটনার সময় উষা কস্তার উরুতে ও তাঁর ছোট বোন রেনু কস্তার কাঁধে গুলি লেগেছিল। তাদেরকে প্রথমে প্যারিশের ডিসপেন্সারীতে আনা হয় চিকিৎসার জন্য। কিন্তু অনবরত পাক-বাহিনীর আনাগোনায় তাঁরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যান আরও উত্তর দিকের কিছু গ্রামে। তাদের মত রাঙ্গামাটিয়া প্যারিশের আরও অনেকে চলে গিয়েছিলেন উত্তরের গ্রাম বাইরা, ছাইতান, বামনগাও ইত্যাদি স্থানে। ঐখানে একটু নিরাপদে ছিলেন কারণ ঐ এলাকা রেল লাইন থেকে বেশ দূরে ছিল। এই প্যারিশের কেউ কেউ আবার ভারতেও চলে গিয়েছিলেন।

৩। **তুমিলিয়া, মঠবাড়ি ও মাউসাইদ প্যারিশ:** ভাওয়াল এলাকার ছয়টি গ্রাম নিয়ে তুমিলিয়া প্যারিশ। রেল সড়কের পাশ দিয়ে অবস্থিত গ্রামগুলোর খ্রিষ্টান-হিন্দু-মুসলিমদের অসংখ্য ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই কারণে প্যারিশের তৎকালীন পালকপুরোহিত ফাদার আলফ্রেড নেফ, সিএসসি এই গ্রামগুলোর জনগণকে প্যারিশ কম্পাউন্ডে আশ্রয় দিয়েছিলেন। বেশির ভাগ মানুষ দিনে বাড়িতে গিয়ে কাজকর্ম করতেন আর রাতে এসে গির্জার আশেপাশে ও স্কুলে ঘুমাতেন। নাগরী প্যারিশের পশ্চিম দিকে অবস্থিত মঠবাড়ি ও মাউসাইদ প্যারিশ। এই দুই প্যারিশের গ্রামগুলোতে প্রচুর শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছিল। মাউসাইদ প্যারিশের পাগাড় ও রাজাবাড়ি এলাকার মানুষেরা টঙ্গীর কাছাকাছি বলে এবং মাঝে মাকে পাক-বাহিনী তাদের উপর আক্রমণ চালাতো বলে তারা নিজেদের বাড়ি ছেড়ে চলে যান নদীর ওপারে অর্থাৎ মাউসাইদ এলাকা ও মঠবাড়ি প্যারিশের পরিবারগুলোতে। ঐ দুই প্যারিশও অসংখ্য শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছিল।

নাগরী ও তুমিলিয়া প্যারিশের অদূরে অবস্থিত ডাঙা নামক এলাকায় পাক সেনারা ও রাজাকারেরা ভয়ংকর আক্রমণ করেছিল। ঘরবাড়ি তারা লুট করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। অসংখ্য তাজা প্রাণ তাদের গুলিতে প্রাণ হারায়। কয়েক হাজার মানুষ সেদিন গ্রাম ছেড়ে বিভিন্ন গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে। ফাদার গেভার্ট লিখেছেন, নাগরী থেকে মাইলখানেক দূরে মুক্তিবাহিনী একদিন একটা চলন্ত ট্রেন উড়িয়ে দিয়েছিল বহু মানুষ সেদিন আহত হয়েছিল। তাদের সাহায্যের জন্য সেদিন ফাদার গেভার্ট একজন ডাক্তারকে নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। তখনি আর একটা ট্রেনে কয়েক শ' মিলিটারী এসে এলোপাতাড়ি গুলি করতে শুরু করে

আর দরিপাড়া, তুমিলিয়া, রাঙ্গামাটিয়া, ইত্যাদি গ্রাম পুড়িয়ে দেয়। ঐ লোকেরা ঘরবাড়ি ছেড়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন মঠবাড়ি প্যারিশের ভাসানিয়া ও অন্যান্য গ্রামে।

৪। লক্ষীবাজার সেন্ট গ্রেগরীজ স্কুল: ঢাকা শহরের লক্ষীবাজারে ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত হলিক্রস ধর্মপল্লী। ঐ চত্বরেই ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী সেন্ট গ্রেগরীজ স্কুল। নভেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অমর্ত্য সেন এবং প্রখ্যাত প্রফেসর ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীর মত অগণিত ব্যক্তি এই স্কুলটির শিক্ষার্থী ছিলেন। পুরাতন ঢাকার ঐ এলাকায় তখন প্রচুর হিন্দু পরিবার বাস করতেন যারা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা-বানিজ্যের সাথে যুক্ত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাক হানাদার বাহিনী ও রাজাকারদের অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার ঐ হিন্দু পরিবারগুলো এবং কিছু খ্রিষ্টান পরিবার এই স্কুলে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। স্কুলের বিভিন্ন শিক্ষক বিশেষত: একজন অন্যতম প্রাচীন শিক্ষক মি: অজয় সরকার (শিক্ষকতার কাল ১৯৬৬ থেকে ২০২০) এবং অধ্যক্ষ ব্রাদার প্রদীপ প্লাসিড গমেজ, সিএসসির সাথে কথা বলে ও বিদ্যালয়ের বার্ষিক ম্যাগাজিনগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে জানা যায়, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সেন্ট গ্রেগরী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ব্রাদার রবার্ট, সিএসসি এবং সাথে কর্মরত ছিলেন আর এক জন আমেরিকান, ব্রাদার নিকোলাস থিলম্যান, সিএসসি সহ আরও কয়েকজন শিক্ষক। ব্রাদারগণ সহৃদয় হয়ে স্কুলের প্রতিবেশী বিপদাপন্ন এই জনগোষ্ঠিকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কিন্তু তখন নিকটস্থ জগন্নাথ কলেজে অবস্থিত ছিল পাক-বাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্প। সেখান থেকে পাক-বাহিনী সদস্যরা সেন্ট গ্রেগরীজ স্কুল কম্পাউন্ডে অনবরত আসা-যাওয়া করতো। হিন্দুদেরকে স্কুল কম্পাউন্ডে আশ্রয় দেওয়াতে পাক সেনারা ব্রাদারদেরকে অনবরত দোষারোপ করে আসছিল।

১৯৭১-এর ৩১ মার্চ ছিল এক ভয়াল দিন। এদিন কুখ্যাত পাকিস্তানীরা সেন্ট গ্রেগরীজ কম্পাউন্ডে আশ্রয় গ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ৩৫জন নিরপরাধ লোককে ধরে নিয়ে যায় জগন্নাথ কলেজের ক্যাম্পে এবং ঐ রাতেই তাদেরকে গুলি করে হত্যা করে। এই বিষয়ে বর্ণনা দিতে গিয়ে ২০০০ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ মার্চ তারিখে 'আজকের কাগজ' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল:

আজ ৩১ মার্চ। ১৯৭১-এর এই দিনে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী পুরাতন ঢাকার লক্ষীবাজার, সেন্ট গ্রেগরী উচ্চ বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আশ্রয় গ্রহণকারী নিরীহ ৩৫ জনকে ধরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। শহীদ ৩৫ জনের মধ্যে সেন্ট গ্রেগরী উচ্চ বিদ্যালয়ের তৎকলীন শিক্ষক এবং ছাত্ররা ছিলো। শহীদ শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন নিখিল চন্দ্র সূত্রধর, ধীরেন্দ্র নাথ পাল চৌধুরী, পি ডি কস্তা এবং শহীদ ছাত্রদের মধ্যে ছিলো উৎপল পাল চৌধুরী এবং শৈবাল পাল চৌধুরী প্রমুখ। শহীদ উৎপল ও শৈবাল ছিল শহীদ ধীরেন্দ্র নাথ পাল চৌধুরীর ছেলে। এছাড়াও শহীদ পল পালমা ছিল এই স্কুলের কর্মচারী।

এই প্রতিবেদনে আরও বলা হয় যে, স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক ব্রাদার রবার্ট সাথে সাথেই জগন্নাথ কলেজের পাক হানাদারদের ক্যাম্পে গিয়েছিলেন তাদের হাত থেকে ঐ ৩৫ জনকে ছাড়িয়ে আনতে। কিন্তু হানাদারেরা ব্রাদারের সাথে চরম দুর্ব্যবহার করে ও হুমকি-ধামকি দিয়ে তাঁকে তাড়িয়ে দেয়। পরে তিনি বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ করলেও তাদেরকে আর ছাড়িয়ে আনতে পারেন নি। ঐ রাতেই এই ৩৫জনকে গুলি করে হত্যা করা হয় ও কলেজের কম্পাউন্ডে গণকবর দেওয়া হয়।

৫। নারিন্দা সেন্ট যোসেফ ট্রেড স্কুল: গ্রামগঞ্জের হতদরিদ্র তরুণদেরকে কর্মমুখী শিক্ষা প্রদান করার উদ্দেশ্যে হলি ক্রস ব্রাদারগণ নারিন্দার সেন্ট যোসেফ ট্রেড স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ৯ মার্চ তারিখে। এই প্রতিষ্ঠানও শরণার্থীদের আশ্রয় ও সেবাদান করেছিল। ব্রাদারদের নিয়মিত লেখা ক্রনিক্‌ল থেকে বিস্তারিত তথ্য ব্যতীতও ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে এই স্কুলের স্বর্ণ জয়ন্তি উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকায় স্কুলের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞ শিক্ষক মি: সুবল গমেজের লেখা থেকেও এ বিষয়ক বিবরণ পাওয়া যায়। সূত্রগুলো অনুসারে জানা যায় যে, ২৫ মার্চ কাল রাতে পাক-বাহিনী দেশের নিরপরাধ মানুষের উপর ঝাপিয়ে পড়লে পার্শ্ববর্তী এলাকার শত শত নারী, পুরুষ ও শিশুকে স্কুলের পরিচালক ও অন্য শিক্ষকগণ এই স্কুলে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এর পর হোস্টেলের ছাত্রদেরকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে হোস্টেল ও কারখানায় শরণার্থীদেরকে থাকতে দেওয়া এবং খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ২৩ নভেম্বর বিকাল ৪ ঘটিকায় ছাত্র ও স্টাফরা ভলিবল খেলছিল। ঐ সময় কয়েকজন রাজাকারের সহায়তায় ৭/৮ জন পাক সেনা অকস্মাৎ কারিগরি বিদ্যালয়ে ঢুকে পড়ে এবং স্টাফ ও ছাত্রদের লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করতে উদ্যত হয়। কিন্তু ঐ মুহূর্তে স্কুলের অধ্যক্ষ ব্রাদার ডোনাল্ড বেকার, সিএসসি (আমেরিকান নাগরিক) ঘটনাস্থলে আসেন এবং অতি সাহসের সহিত ঐ বিপদ হতে সবাইকে রক্ষা করেন। তিনি পাক সেনাদের বলেন, ওরা সকলেই আমার লোক; এখানে অখ্রিষ্টান কেউ নেই। ওদের গুলি করার আগে আমাকে গুলি করতে হবে। অগত্যা পাক বাহিনী ও রাজাকারেরা বিদায় নেয়; আর কখনও তারা এই কম্পাউন্ডে প্রবেশ করে নি।

৬। হলি ক্রস কলেজ ও বটমলী হোম অফানেজ: মি: রণদাপ্রসাদ সাহা (আর পি সাহা) ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর স্নেহময়ী মায়ের স্মরণে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কুমুদিনী ট্রাস্ট, যার অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছে ভারতেশ্বরী হোমস, কুমুদিনি গার্লস কলেজ, দেবেন্দ্র কলেজ, উমেন্স মেডিকেল কলেজ, নার্সিং স্কুল ও কলেজ প্রভৃতি। বৃটিশ শাসনামলে মি: আর পি সাহা ২,৫০০,০০/- টাকা দান করেছিলেন বৃটিশ রেড ক্রসকে। পাকিস্তান সরকারের সাথেও তাঁরা অনেক সহযোগিতা করে আসছিলেন। তথাপি কুখ্যাত পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নির্মম হাত থেকে রক্ষা পায়নি মানবতার আদর্শ মি: আর পি সাহা ও তাঁর পরিবার। কুমুদিনি ট্রাস্ট-এর পরিচালক মি: আর পি সাহা ও তাঁর ২৬ বছর বয়স্ক পুত্র ভবানী প্রসাদ সাহাকে এপ্রিল মাসে

পাকিস্তানী সেনাবাহিনী তুলে নিয়ে যায়। এরপর মানবদরদী ও মানবসেবার আদর্শ বাংলাদেশের এই দুই মহান ব্যক্তিত্ব আর ফিরে আসেন নি। আর পি সাহা'র দুঃখ-পীড়িত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও ভীত-সন্ত্রস্ত সহধর্মিনী ও তাঁর সাথে আরও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি আশ্রয় নিয়েছিলেন হলিক্রস কলেজে। কখনও কখনও বটমলী হোম অর্ফানেজ-এ গিয়েও থাকতেন। হলি ক্রস কলেজে কর্মরত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক সিষ্টার মাইকেল সিএসসি, সিষ্টার যোসেফ মেরী, সিএসসি এবং বটমলীর পরিচালক মাদার মেরী আগ্নেস, এসএমআরএ স্বনামধন্য এই পরিবারের কয়েকজনকে খুব গোপনে রক্ষা করেছেন ও সাহস যুগিয়েছেন।

৭। জলছত্র: বৃহত্তর ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল জেলার মধুপুরে হলো জলছত্র-পীরগাছা-দরগাচালা এলাকা। এখানে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে পালক পুরোহিত ছিলেন মার্কিন নাগরিক ফাদার ইউজিন হোমরিক, সিএসসি। গারো সমাজকে তিনি হৃদয় থেকেই ভালবেসেছিলেন এবং দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরাধিককাল পরিশ্রমের মাধ্যমে এতদঞ্চলের গারো সমাজের আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি সার্বিক উন্নয়নে তিনি অতুলনীয় অবদান রেখে আসছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি প্যারিশের কম্পাউন্ডে শরণার্থীদের স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো, অত্যন্ত সাহসী ও দূরদর্শী এই মানুষটি মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সংগঠিত করেছেন। যুবকদেরকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে উৎসাহিত করেছেন, তাদেরকে আর্থিকভাবে সহায়তা করেছেন ও নিজের হাতে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করেছেন। এই কারণে তাঁকে বাংলাদেশের বন্ধু হিসাবে খেতাব দেওয়া হয়েছিল ও স্বাধীনতা পদক দেওয়া হয়েছিল।

৮। বান্দুরা স্কুল, হাসনাবাদ, গোল্লা, বন্দরনগর, তুইতাল, সোনাবাজু: রাজধানীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে নবাবগঞ্জেরও পশ্চিমে অবস্থিত 'আঠারো গ্রাম' নামে পরিচিত খ্রিষ্টান এলাকার আশেপাশে প্রচুর হিন্দুদের বাস। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী সৈন্যরা বান্দুরা এলাকার হিন্দুদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল, অনেককে হত্যা করেছিল। ইত্রাশী গ্রামে বেশ কিছু খ্রিষ্টান ঘরবাড়িও তারা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল এবং ওখানকার কয়েকজন মানুষকে তারা হত্যা করেছিল। আশেপাশের অনেক হিন্দুদের উপর তারা অত্যাচার করেছে। এই কারণে ঐসব এলাকা থেকে এবং ঢাকা থেকেও আগত বহু হিন্দু পরিবার আঠারো গ্রামের এই এলাকার খ্রিষ্টান পরিবারগুলোতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। বান্দুরা স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক ছিলেন ব্রাদার জন রোজারিও সিএসসি। তিনি ঐ স্কুলের হিন্দু শিক্ষকদেরকে সপরিবারে স্কুলে আশ্রয় দিয়েছিলেন। ব্রাদারের কাছে তাঁরা মূল্যবান সোনা-রূপার গহনাগুলো ও টাকা-পয়সা জমা রেখে নিশ্চিন্তে মাঝে মধ্যে এদিক-সেদিক যেতেন। এভাবে ব্রাদারের আশ্রয়েই সংগ্রামের দিনগুলো কাটিয়েছেন।

গোল্লা প্যারিশের পালকপুরোহিত ছিলেন মার্কিন নাগরিক ফাদার উইলিয়াম ইভান্স, সিএসসি। গোল্লার উপ-প্যারিশ বন্দরনগরে তখন বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা ছিল; পরিবারগুলোতেও আশ্রয় নিয়েছিল অনেক হিন্দু শরণার্থী। এমতাবস্থায় ১৯৭১ এর ১৩ নভেম্বর ফাদার ইভান্স ধর্মীয় উপাসনা পরিচালনার জন্য নৌকায় করে যাচ্ছিলেন বন্দরনগর। নবাবগঞ্জে ছিল পাকিস্তানী জান্তাদের ক্যাম্প। পাকিস্তানী ঐ পশুগুলো জানতে পেরেছিল যে ফাদার ইভান্স মুক্তিযোদ্ধাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন ও শরণার্থীদেরকে আশ্রয় দেন। ফাদার ইভান্সকে নৌকা ভিড়িয়ে তাদের ক্যাম্পে যেতে বলা হলো। ফাদার তাদের সাথে দেখা করতে গেলেন এবং কথা বলে যখন তিনি নৌকায় ফিরে যাচ্ছিলেন তখন নরপিশাচগুলো পেছন থেকে ফাদারকে আক্রমণ করে। বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে মানব-সেবায় জীবন উৎসর্গকারী ফাদার ইভান্সকে। তাঁর মৃতদেহ তারা ইছামতি নদীতে ফেলে দেয়। কয়েকদিন পরে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায় কয়েক মাইল দূরে, কোমরগঞ্জে।

৯। বনপাড়া, বর্ণি ও মধুরাপুর: মুনতাসীর মামুন ও মাহবুবুর রহমান সম্পাদিত গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ (নাটোর জেলা, ২০১৮) বইয়ের মধ্যে ফাদার সুশীল লুইস পেরেরা একটি অংশে লিখেছেন যে, বনপাড়া আওয়ার লেডি অব লুর্ডস প্যারিশে তখন পালক পুরোহিত ছিলেন ইতালিয়ান নাগরিক ফাদার পিনুস, পিমে। এই প্যারিশের খ্রিষ্টান অধ্যুষিত গ্রামগুলোর আশেপাশে বসবাসকারী হিন্দু পরিবারের প্রায় তিনশ' বিপদগ্রস্ত সদস্য পাক বর্বরদের আক্রমণের ভয়ে বনপাড়া প্যারিশে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। রাজাকারদের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানী নরপশুগুলো খবর পায় যে, খ্রিষ্টান মিশনারীরা বনপাড়া প্যারিশে 'দেশদ্রোহী' হিন্দুদের এবং সেই সাথে মুক্তিবাহিনীকেও আশ্রয় দিয়েছে। এতে ৩ মে তারিখে পাক হানাদার বাহিনী বনপাড়া প্যারিশে এসে হানা দেয়। ইতালীর মত এত ধনী একটি দেশ ত্যাগ করে বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশে এসে মানব সেবায় ব্রতী হয়েছিলেন ফাদার পিনুস। তিনি রাজাকার আর পাকিস্তানী জান্তাদের হাতে এত সহজেই তাঁর দরিদ্রতম বন্ধুগুলোকে তুলে দিতে পারেন? না, তিনি তাদের রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে বলপূর্বক প্যারিশ চত্বরে ঢুকে পড়ে। তারা গির্জাঘর অপবিত্র করে, মিশনের অফিস, স্কুলঘর, মহিলাদের হোস্টেল ইত্যাদি তল্লাশী করে। তারা ট্রাক নিয়ে এসে ঐ শরণার্থীদের মধ্য থেকে ৮৬জন পুরুষ লোকদেরকে তুলে নিয়ে যায়। নাটোর যাওয়ার পথে একটা খালের উপরের ব্রিজের পাশে লাইনে দাঁড় করিয়ে তাদেরকে গুলি করে হত্যা করে ও খালের কাছেই তাদেরকে গণ কবর দিয়ে রাখে। এই ঘটনায় শুধু নিহতদের স্বজনেরা এবং ফাদার পিনুসই নন, ঐ প্যারিশের প্রতিটি মানুষই মর্মাহত হয়েছিলেন। (গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ, নাটোর জেলা)। ফাদার সুশীল লুইসের এই তথ্যের সাথে বিশপ জের্ভাস রোজারিও একমত পোষণ করেছেন।

অন্যদিকে বনপাড়ার প্রতিবেশী মারীয়াবাদ প্যারিশ বর্ণির পালক-পুরোহিত ইতালিয়ান নাগরিক ফাদার কান্তন, পিমে,

বনপাড়া প্যারিশের দুর্ঘটনা দেখে তাঁর প্যারিশে কোন শরণার্থীদেরকে স্থায়ীভাবে রাখলেন না; অস্থায়ীভাবে শরণার্থীরা আসা-যাওয়া করতে পারতো এবং ফাদারের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করতে পারতো। তবে বর্ণির পরিবারগুলোতে অগণিত শরণার্থী স্থান পেয়েছে এবং স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত তারা ঐ আশ্রয়েই কাটিয়েছে।

১০। রুহিয়া ও কসবা: মুক্তিযুদ্ধকালে দিনাজপুর ডাইয়োসিসের রুহিয়া ফাতিমা রানি প্যারিশের পালক পুরোহিত ফাদার লুকাস মারান্ডি তাঁর প্যারিশ কম্পাউন্ডে মুক্তিযোদ্ধাদের ও শরণার্থীদেরকে আশ্রয় দিয়ে চিকিৎসা সহ তাদের সার্বিক দিক দেখাশুনা করছিলেন। রাজাকারেরা সেই কথা পাকবাহিনীকে জানিয়ে দিয়েছিল। পাক-বাহিনী ফাদার লুকাসকে সাবধান করেছিল এবং হুমকিও দিয়েছিল। ফাদার লুকাস ভয় পান নি, বরং তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থেকে আশ্রয় ও সেবাদান চালিয়ে যাচ্ছিলেন কারণ যাদের তিনি আশ্রয় দিয়েছেন তাদের কীভাবে চলে যেতে বলবেন? পাক-বাহিনী ফাদার লুকাসকে নিস্তব্ধ করে দিল, ওই শয়তানগুলো তাঁকে হত্যা করলো। এর পর শরণার্থীরা ঐ প্যারিশ ছেড়ে ভারতে চলে যায় এবং মুক্তিযোদ্ধারাও অন্যত্র চলে যায়। প্রতিবেশী দেশ ভারত খুব বেশি দূর না হওয়ায় এই ডাইয়োসিসের বিপদাপন্ন মানুষেরা বেশিরভাগই ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। কোন কোন মানুষ প্যারিশগুলোতে এবং খ্রিষ্টান পরিবারগুলোতে আশ্রয় নিয়েছিল। ডা. বীরেন সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন দিনাজপুরের সেন্ট ভিনসেন্ট হাসপাতালে। সেখানে তিনি রোগীদের চিকিৎসার কাজে জড়িত হয়ে নিজেকে মিশনারীদেরই একজন হিসাবে পরিচয় দিতেন। এভাবে চার্চের মাধ্যমে তিনি এবং এরকম অগণিত আরও মানুষ রক্ষা পেয়েছে।

১১। পাদ্রিশিবপুর ও বরিশাল: ফাদার লাজারুস কানু গমেজ জানান, পাদ্রিশিবপুর প্যারিশের পালক-পুরোহিত ছিলেন কানাডিয়ান নাগরিক ফাদার জার্মেইন, সিএসসি, আর সেন্ট আলফ্রেড হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক ছিলেন ব্রাদার জন ব্যাপ্টিস্ট, সিএসসি। ব্রাদার ব্যাপ্টিস্টের এক বোনের স্বামী যুক্ত ছিলেন পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সাথে। তাঁরই অনুরোধে পাকিস্তানীরা বাকরগঞ্জের এই অংশে তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতি করে নি। অন্যদিকে ফাদার জার্মেইন নিজেই একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে কাজ করেছেন। সেন্ট আলফ্রেড স্কুলকে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প হিসাবে ব্যাবহারের সুযোগ দিয়েছেন। মেজর ওমর ও মেজর নাসির নামে দুইজন প্রখ্যাত মেজর এই এলাকায় যুদ্ধ করেছেন। মেজর ওমর তাঁর মুক্তিবাহিনী নিয়ে স্থানীয় থানা আক্রমণ করেছিলেন। এ সময় তাঁর পায়ে গুলি লেগেছিল এবং ফাদার জার্মেইন তাঁকে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলেছিলেন। অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সহ সার্বিক দিক ফাদার জার্মেইন নিজেই দেখাশুনা করতেন। ফাদার কানু আরও জানান, বরিশাল এলাকার প্যারিশগুলোর কম্পাউন্ডে বেশি সংখ্যক শরণার্থী আশ্রয় না নিলেও প্রায় প্রতি পরিবারেই অগণিত হিন্দু পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল। তারা নিজ নিজ সোনা-রূপার অলংকার ও টাকা-পয়সা সহ বিভিন্ন মূল্যবান জিনিসপত্র জমা রেখে আশ্রয় নিয়েছিল পরিবারগুলোতে। তবে নিরাপত্তার কথা ভেবে পাদ্রিশিবপুরের সিষ্টারদের কনভেন্টে যুবতী মেয়েদেরকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। প্যারিশে বা পরিবারে যারা আশ্রয় নিয়েছিল তারা মাঝে মাঝে সুযোগ বুঝে নিজেদের ঘরবাড়ি দেখতে যেতো এবং ফিরে এসে খ্রিষ্টান পরিবারগুলোতেই থাকতো। এভাবে সংগ্রাম চলাকালীন সময়টুক তাঁরা নিরাপদে কাটিয়েছেন।

বরিশাল প্যারিশের পালক পুরোহিত ছিলেন ফাদার সেন্ট পিয়ের, সিএসসি। তিনি প্যারিশের নিচের তালায় শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের থাকার জায়গা দিয়েছিলেন। নারিকেলবাড়ি প্যারিশের চারিদিকেই ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের নৌকা। প্যারিশ কম্পাউন্ডে থাকতো প্রায় তিন শ' শরণার্থী। ওখানকার পালক-পুরোহিত ছিলেন ফাদার ডেমার্স, সিএসসি এবং ফাদার ফিলিপ রোজারিও। ঐ প্যারিশের সিষ্টারদের কনভেন্ট ও ক্লিনিকে শরণার্থীদেরকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল।

১২। বানিয়ারচর, হলদিবুনিয়া ও শেলাবুনিয়া: খুলনা অঞ্চলের বেশির ভাগ প্যারিশ বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের তুলনামূলকভাবে নিকটবর্তী বলে নির্যাতিত, বিপদাপন্ন ও ভীত-সন্ত্রস্ত অগণিত পরিবার সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। কিন্তু কিছু কিছু স্থানে শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধা প্যারিশে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। বানিয়ারচর প্যারিশের পালকপুরোহিত ছিলেন ইতালিয়ান নাগরিক বাংলাদেশের বন্ধু ও স্বাধীনতা পদক প্রাপ্ত ফাদার মারিনো রিগন, এসএক্স। তাঁর প্যারিশ বানিয়ারচরে মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীরা আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। তাদেরকে তিনি টাকাপয়সা ও খাদ্য দিয়ে সহায়তা করতেন, যুদ্ধে জয়লাভে তিনি তাঁদের সাহস যুগিয়েছেন। হলদিবুনিয়া প্যারিশে কয়েকটি পরিবার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। যশোর ফাতিমা হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন ইতালিয়ান নাগরিক ফাদার মারিনো, এসএক্স। হাসপাতাল কম্পাউন্ডে পাক-বাহিনী প্রবেশ করেছে শুনে লোকজন পালাতে শুরু করে। কিন্তু তিনি বের হন বাইরে। অমনি পাকিস্তানী নরপশুগুলো ফাদারকে বিনা কারণে গুলি করে হত্যা করে। শেলাবুনিয়া প্যারিশের নিকটেই অবস্থিত মংলা বন্দর। প্রায় সারা বছরই সেখানে বিদেশ থেকে জাহাজ এসে ভিড়ে, মাল খালাস করে বা মাল ভর্তি করে, আবার তারা চলে যায়। একবার ভারতের বোমারু বিমান ঐ জাহাজগুলোতে বোমা বর্ষণ করে। এতে জাহাজে কর্মরত দেশী-বিদেশী কর্মীরা ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। তারা শেলাবুনিয়া প্যারিশে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। অবস্থা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত শেলাবুনিয়া প্যারিশ তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিল।

১৩। নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ও বান্দরবান: নোয়াখালি-র সোনাপুরে অবস্থিত আওয়ার লেডি অব লুর্ডস প্যারিশে তখন কর্মরত ছিলেন কানাডিয়ান নাগরিক ফাদার বেনোয়া, সিএসসি। গ্রামগুলোর প্রায় প্রতিটি পরিবারেই আশ্রয় নিয়েছিল অগণিত হিন্দু পরিবার। পাক হানাদারেরা টহল দিতে এলে তিনি তাদেরকে

নিয়ে ঘুরতে যেতেন ও সব মানুষ খ্রিষ্টান চার্চের বলে পরিচয় করিয়ে দিতেন। এভাবে ঐ অসহায় মানুষগুলো রক্ষা পেয়ে গেছে। বান্দরবান তখনও ছোট্ট একটি শহর। এলাকার বেশিরভাগ মানুষই আদিবাসী হলেও কিছু মানুষ ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী। তারাও কিন্তু পাকিস্তানীদের হাত থেকে রেহাই পায়নি, কেননা, পাকিস্তানীরা ঐ অঞ্চলেও হানা দিয়েছিল। ফাদার লাজারুস কানু গমেজ বলেন, বেশ কিছু মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করেছিল বান্দরবান প্যারিশের হোস্টেলগুলোতে। পালক পুরোহিত ছিলেন ফাদার ডি' ক্রুজ, সিএসসি ও সহকারী ছিলেন ফাদার নেলসন, সিএসসি প্রমুখ। দুই ফাদারই সকলের কাছে ঐ শরণার্থীদের রক্ষা করেছেন এই বলে যে তারা খ্রিষ্টান সমাজের মানুষ।

১৪। নটর ডেম কলেজ: নটর ডেম কলেজ কোন শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়নি, কিন্তু এই কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার রিচার্ড ডব্লিও টিম, সিএসসি দেশের সকল শরণার্থীদের দুরবস্থা বিশ্বদরবারে তুলে ধরে অবিলম্বে পাকিস্তানীদের দ্বারা বাঙালীদের গণহত্যা এবং অত্যাচার-নির্যাতন বন্ধ করার জন্য বারংবার তাড়া দিয়েছেন, শরণার্থীদের ত্রাণসাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের মানুষের পুনর্বাসন ও উন্নয়নের জন্য কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। ফাদার টিম তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থে (Forty Years in Bangladesh: Memories of Father Timm, 1995) লিখেছেন, নটর ডেম কলেজে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা আসা-যাওয়া করতেন, তাঁদের সাথে ফাদারদের ভাল সম্পর্ক ছিল। ক্লাস, পরীক্ষা ইত্যাদি রীতিমত চালিয়ে যাওয়ার জন্য একদিকে পাকিস্তান সরকার স্কুল-কলেজগুলোকে নির্দেশ দিয়েছিল, অন্য দিকে মুক্তিবাহিনী চিঠি দিয়ে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার পাল্টা নির্দেশ দিয়েছিল। পার্শ্ববর্তী টিএন্ডটি কলেজের একাংশ মুক্তিযোদ্ধারা বোমা দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু নটর ডেম কলেজের কোন ক্ষতি তারা করেনি কারণ ফাদার টিম গোপনে তাদের কাজে উৎসাহ দিতেন ও তারা আহত হলে তাদের চিকিৎসা, খাওয়া-দাওয়া ও অন্যান্য খরচের জন্য অর্থ সরবরাহ করতেন। ফাদার টিম তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থে আরও লিখেছেন, ১৯৭০-এর ভয়ংকর সাইক্লোনের পর সাইক্লোন-বিধ্বস্ত মানুষের পুনর্বাসনের জন্য তিনি ইতিমধ্যেই কোর (CORR—Christian Organization for Relief and Rehabilitation) এর মাধ্যমে কাজ করছিলেন। এই অবস্থায় স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানীরা যে-সমস্ত মানুষের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছিল ও সর্বস্ব লুট করে নিচ্ছিল সেরকম ৬৫টি গ্রামের ১০,০০০ হিন্দু জনগোষ্ঠীকে ফাদার এডমন্ড গেডার্ট, সিএসসি নাগরী সেন্ট নিকোলাস প্যারিশে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এই সময় বাংলাদেশে কাজ করছিল আমেরিকান সাহায্য সংস্থা সিআরএস (Catholic Relief Service), যার পরিচালক ছিলেন এন্ডি কোভাল। ফাদার টিমের সহায়তায় এন্ডি কোভাল নাগরী প্যারিশের ঐ মানুষগুলোর আশ্রয়, খাদ্যপানীয়, চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। বেশ কয়েবার সিআরএস ফাদার গেডার্টকে আর্থিক সহায়তা পাঠিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এবং পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেছে বলে পাকিস্তান যে গণহত্যা করে চলছিল, হাজার হাজার মানুষের বাড়ি লুট করে সেগুলো পুড়িয়ে দিচ্ছিল সেগুলো যুক্তরাষ্ট্র দেখেও দেখেনি। তাই ফাদার টিম আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক কাজ করেছেন যেন বাঙালিদের উপর পাকিস্তানীদের অত্যাচার দ্রুত বন্ধ হয় ও পাকিস্তানের হাত থেকে বাংলাদেশকে স্বাধীন করা হয়। ইংল্যান্ডের গ্রানাডা টিভিকে তিনি ৭ সেপ্টেম্বর দীর্ঘ দুই ঘণ্টা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। সেপ্টেম্বর মাসেরই ১১ তারিখে তিনি ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যের দুইজন সিনেটর বির্চ বেঈ এবং ভ্যান্স হার্টকী-র নিকট দীর্ঘ এক চিঠিতে পাকিস্তানী নরপশুদের অত্যাচার ও নির্যাতনের বর্ণনা দিয়ে মানুষকে দু:খ-কষ্টের হাত থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের অনুরোধ করেন। এর পর আবার ২০ সেপ্টেম্বর তিনি টেস্ট কেইস হিসাবে নারিন্দার ১৫-২০টা হিন্দু পরিবারের কথা Rohdes এর কাছে লিখেন যাদের ঘরবাড়ি দখল করে নেওয়া হয়েছিল। এই বিষয়গুলো নিয়ে তিনি ২৫ সেপ্টেম্বর লিখেন জাতিসংঘের কাছে। এরপর ২৯ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ৭০জন কর্মী ঢাকায় আসেন ত্রাণের কাজ করার জন্য। ইউনিসেফ যে ৪০০ গাড়ি দিয়ে ত্রাণের কাজ করছিল পাকিস্তানী সেনাবাহিনী সেগুলো অধিকার করে নিয়েছিল। এই খবরটি ফাদার টিম নিউইয়র্ক টাইমস-এ লিখেছিলেন। তাঁর এসব বিষয়ে লেখার ফলে আন্তর্জাতিক সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছিল যার ফল দেখা গেছে ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর ম্যাগসায়সায় পুরস্কারের মাধ্যমে।

শেষ কথা: মুক্তিযুদ্ধের উপলব্ধিতে পরিপূর্ণ এই দেশের মানুষের হৃদয়ে ধর্ম, বর্ণ বা গোত্র কোন কিছুই ভেদাভেদ সৃষ্টি করতে পারে নি, বরং পাকিস্তানীদের ধ্বংসযজ্ঞ ও নানারকম অত্যাচার-নির্যাতন সকল ধর্ম, শ্রেণি ও পেশার মানুষকে এক করে তুলেছিল। মুক্তির আকাঙ্ক্ষা শাণিত করে তুলেছিল এখানকার প্রতিটি নারী-পুরুষকে। বঙ্গবন্ধুর আহ্বান বাংলাদেশের অন্য সকল মানুষের মত করে খ্রিষ্টানদেরও অনুপ্রাণিত করেছিল। তারা জানে, এই দেশেই তাদের জন্ম, এই দেশেই লালিত-পালিত, এই দেশের সাথেই তারা একাকার, এই দেশেরই আলো-বাতাসে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া মানুষ। এ ছাড়া অন্য কিছুই তারা ভাবে নি, ভাববার দরকারও বোধ করে নি। মূলত: এ কারণেই যুদ্ধের পরে দেখা গেল, আমাদের দেশে খ্রিষ্টভক্তদের সংখ্যা খুবই নগন্য হলেও জনসংখ্যার তুলনায় মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টানদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। আর এই দেশের চার্চ, সেও তো এই দেশের আদলেই গড়া কারণ এই দেশের মানুষদের নিয়েই এই দেশের চার্চ। এই কারণে এই দেশের চার্চ মুক্তিযুদ্ধেও সাথে মনেপ্রাণে এক হয়েছে ও যথাসাধ্য সহায়তা করেছে।

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচার, নির্যাতন,

নিপীড়নে অতিষ্ঠ বাঙালী জাতির প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষ স্বাধীনতার লাল সূর্য স্ব-চক্ষে প্রত্যক্ষ করার আশায় হাহাকার করছিল। বাঙালী জাতি সংগ্রাম করেছে জেতার জন্য, চরম কষ্টের তপ্ত মরুপথে তারা হেঁটেছে কিন্তু আশা ছেড়ে দেয় নি; অনেকবার বাঁকা হয়ে গেছে কিন্তু ভেঙ্গে যায় নি। ব্যক্তি হিসাবে এই জাতির প্রত্যেকেই মুক্তি পাওয়ার জন্য যেমন একদিকে আকাঙ্ক্ষা করেছে, তেমনি গোটা জাতির মুক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে লড়াই করেছে। আমরাই সেই জাতি যে জাতি হাসতে হাসতে মরতে শিখেছে কিন্তু শত্রুর কাছে হার মানেনি। মুক্তিযুদ্ধে আমরা যেভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে পরাধীনতার হাত থেকে রক্ষা করে দেশকে স্বাধীন করেছিলাম, বর্তমান বাংলাদেশকে তেমনি আমরা উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যেতে সক্ষম হবো।

তথ্যসূত্র

১। সাধু যোসেফের কারিগরি বিদ্যালয় (২০০৪). সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা-১৯৫৪-২০০৪, নারিন্দা, ঢাকা।

২। St. Joseph's Trade School, Holy Cross Brothers' Chronicles 1954-2020, Narinda, Dhaka.

৩। কস্তা, বি., (১৯৯৬). স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন স্মরণিকা, স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আন্তঃমাণ্ডলিক ঐক্য পরিষদ, কাকরাইল, ঢাকা, ১৯৯৬।

৪। সেন্ট গ্রেগরীজ হাইস্কুল এন্ড কলেজ, দ্য গ্রেগরীয়ান (বাৎসরিক ম্যাগাজিন), ২০০০, ২০০১, ২০০৩, ২০০৬।

৫। মামুন, মা., রহমান, মা., (২০১৮). গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ, নাটোর জেলা, *ফাদার সশীল লুইস পেরেরা।*

৬। টেলিফোন সাক্ষাতকার

(লেখক: রেজিস্ট্রার, নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলদেশ ,একাধিক গ্রন্থ রচয়িতা ও অনুবাদক।)

বাংলাদেশে খ্রিস্টানদের স্বদেশ প্রেম

ড. ইসিদোর গমেজ

"বাংলাদেশে খ্রিস্টানদের স্বদেশ প্রেম", লেখার বিষয়টি পেয়ে প্রথমে আমি থমকে গিয়েছিলাম। দেশপ্রেম বা স্বদেশ প্রেম কি কখনো ধর্মের পরিচয়ে বিবেচনা করা যায়! বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী, আদিবাসী, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে জন্মসূত্রে সকলেইতো বাংলাদেশের নাগরিক। বাংলাদেশ আমাদের সকলেরই "স্বদেশ"। একজন বিত্তশালী, রাজনীতিবিদ, প্রভাবশালী ব্যক্তি, গরীব দুঃখী, এমন কি একজন ভিখারীর জন্যও বাংলাদেশ তার স্বদেশভূমি- মাতৃভূমি !

একটি দেশের মানুষ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সেই নির্দিষ্ট দেশের নাগরিক। সমগ্র পৃথিবীতে কত দেশ আছে, কত শত সহস্র জাতি সত্তা আছে। যে যেখানেই জন্ম গ্রহণ করুক না কেন, সেখানকার মাটি, পানি, বাতাস, আকাশ, নদী, পাহাড়, বৃক্ষরাজিকে কেন্দ্র করেই বেড়ে উঠে। তার জন্মদাত্রি মা ও বাবার ভাষাই তার মাতৃভাষা। সেই ভূমিই তার জন্মভূমি এবং সেখানকার প্রকৃতি হলো তার স্বদেশ প্রেমের প্রধান ভিত্তি।

স্বদেশপ্রেম মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হলেও তাকে বিকশিত বা প্রকাশিত করার জন্য কতগুলো ফ্যাক্টর কাজ করে। মানুষ যদি মানুষকে ভাল না বাসে, প্রতিবেশীকে ভাল না বাসে, প্রকৃতিকে ভাল না বাসে, তবে স্বদেশপ্রেম বিকশিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে স্বদেশপ্রেম মূলত সৃষ্টি হয় জন্মের পর পরিবার থেকে।

প্রথমেই একটি বিষয় পরিষ্কার করে নেয়া ভাল। বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা মাত্র .০৩৫ ভাগ মানুষ খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী। অর্থাৎ মোটামুটি ৬ লক্ষ মানুষ খ্রিস্টান। আর এই ছয় লাখ মানুষের মধ্যে বাংলা ভাষাভাষী (বাঙ্গালী) ছাড়া ক্ষুদ্র ও নৃ-তাত্ত্বিক জাতিসত্তার ৭৩ টির মধ্যে ৪৫টি আদিবাসী জনগোষ্ঠির অনেকে খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসী। আদিবাসি খ্রিষ্টানদের মধ্যে গারো সম্প্রদায়ের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী, তারপর সম্ভবত সাঁওতাল, খাসিয়া, ত্রিপুরা মারমা, চাকমা, মুরং নৃ-গোষ্ঠির বাংলাদেশী খ্রিষ্টান সম্প্রদায়। এছাড়াও ওড়াওঁ, হাজং, কোচ, মাহালো, মালো, মনিপুরীসহ অনেক আদিবাসী খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী। লক্ষ্যনীয় যে, উল্লেখিত প্রত্যেকটি নৃ-গোষ্ঠির স্বতন্ত্র মাতৃভাষা আছে। তবে তাদের প্রায় সকলেই বাংলা ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে, তারা বাংলাদেশের প্রতি অনুগত এবং বাংলাদেশকে তারা তাদের মাতৃভূমি মনে করে এবং স্বদেশকে রক্ষা করতে জীবন উৎসর্গ করতে পারে। তার প্রমান তারা দিয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

বাংলাদেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা, বাঙ্গালী আদিবাসী নির্বিশেষে শৈশবকাল থেকেই মানুষকে ভালবাসার শিক্ষা গ্রহণ করে। যিশু খ্রিস্টের অমর বানী, "তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত করে ভালবাসবে"- এই বাক্যটি খ্রিস্টান পুরোহিত/পালকগণ চার্চের উপাসনায়/প্রার্থনায় বারবার স্মরণ করিয়ে দেন। পরিবারের পিতা-মাতাও সন্তানদের সেভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন।

আসলে মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম তথা স্বদেশ প্রেম এভাবেই জাগিয়ে তুলতে হয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষকে ভালবাসতে না শিখলে দেশকে ভালবাসা যায় না। একজন ব্যক্তির স্বদেশ প্রেম বা দেশপ্রেমের গভীরতা বোঝা যায় দেশের দুঃসময়ে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সংগ্রামের সময়। বাংলাদেশের খ্রিষ্টান সম্প্রদায় এসব ক্ষেত্রে বারবার তাদের স্বদেশ প্রেমের স্বাক্ষর রেখেছে।

যেহেতু আলোচ্য বিষয় সমষ্টিগতভাবে বাংলাদেশের খ্রিস্টানদের দেশপ্রেম বা স্বদেশ প্রেম। আমি কতগুলো উদাহরণের মাধ্যমে আমাদের স্বদেশপ্রেম সম্পর্কে ধারনা দেয়ার চেষ্টা করছি।

০১. এই বঙ্গদেশে খ্রিষ্টধর্ম মূলত বিদেশী মিশনারীদের মাধ্যমে আসে। ৪০০-৫০০ বছর আগে পর্তুগীজ, ডাচ্, বৃটিশ, ফরাশী মিশনারীগণ বঙ্গসন্তানদের খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করলেও, তাদের মাতৃভাষা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে পরিবর্তন করতে পারে নি। উপরন্তু খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত ব্যক্তি বা সমাজ ধর্মীয় উপাসনা ও প্রার্থনা এদেশীয় ভাষায় রুপান্তরিত করে প্রমান করেছে, এদেশের মাটি, মানুষের প্রতি তাদের ভালবাসা কত গভীর। বাংলাদেশের খ্রিষ্টানদের উপাসনা, প্রার্থনা, আচার অনুষ্ঠান স্থানীয় ভাষায় সম্পন্ন করা হচ্ছে। এমনকি, গারো ভাষায়, সাঁওতাল, খাসিয়া ও ত্রিপুরা ভাষায় ধর্মীয় গান ও প্রার্থনা করা হয়। ধর্মীয় গানের মধ্যে শুধু ঈশ্বরপ্রেম নয়, স্বদেশপ্রেমও জাগ্রত হয়।

০২. ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির প্রাক্কালে পূর্ব বঙ্গের বেশীরভাগ চাকুরীজীবী ও উচ্চ-শিক্ষার্থী উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কোলকাতা, দিল্লী, বোম্বেসহ বিভিন্ন শহরে বসবাস করতো। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ বিভাগের পর পূর্ব বঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তান থেকে ব্যপক হারে হিন্দু জনগোষ্ঠি তাদের জন্মভূমি ছেড়ে ভারতে (পশ্চিম বঙ্গে) চলে যায়। অপরদিকে ভারত থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেক পরিবার (বিশেষভাবে বিহারী) পূর্ব পাকিস্তানে মাইগ্রেট করে। কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক খ্রিস্টান চাকুরির কারণে ভারত অংশে থেকে

যায় এবং বেশীরভাগ খ্রিস্টান (মূলত বাঙ্গালী) তাদের জন্মস্থান পূর্ব বঙ্গে চলে আসে। পরে তারা ঢাকা, চট্টগ্রাম, করাচী, লাহোর, রাওয়ালপিন্ডি শহরে চাকুরির ব্যবস্থা করে এদেশেই রয়ে গেছে।

০৩. বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সময়কার একটি ছোট্ট ঘটনার কথা বলছি। মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার তুমুল আন্দোলন চলছে সমগ্র পূর্ব বাংলায় (পূর্ব পাকিস্তানে)। আন্দোলনের ঢেউ গ্রাম-গঞ্জের স্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। তখনকার দিনে মিশনারী স্কুলগুলোতে রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন/কার্যক্রম এমনকি স্লোগান দেয়ারও অনুমতি ছিলনা। বায়ান্ন সনের ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকার রাজপথ ছাত্রদের মিছিলে মিছিলে উত্তাল হয়ে উঠে। পাকিস্তান সরকারও আন্দোলন দমাতে কঠোর বন্দুকের নল ব্যবহার করছে। একুশে ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের উপর পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালিয়ে অনেক ছাত্রকে হতাহত করে। খবরটি তখন বিদ্যুৎবেগে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকা থেকে ২৫ মাইল দূরে বান্দুরা হলিক্রশ স্কুলেও খবরটি পৌঁছে যায়। সাথে সাথে শ্রেণিকক্ষের ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। দশম শ্রেণির ক্লাস নিচ্ছিলেন আমেরিকান ব্রাদার। হঠাৎ প্রথম বেঞ্চের ছাত্র বেনেডিক্ট গমেজ ক্লাশ থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে স্কুলের ছুটির ঘন্টা বাঁজিয়ে দেয় এবং ছাত্ররা বের হয়ে আসে এবং প্রতিবাদ মিছিল করে। এটা ছিল খ্রিস্টান মিশনারী স্কুলের একজন খ্রিস্টান ছাত্রের এক দুঃসাহসিক কাজ। দেশের প্রতি, মাতৃভাষার প্রতি ভালবাসার বিরল দৃষ্টান্ত। ঐ প্রতিবাদী ছাত্রটিই পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ থেকে মাস্টার্স ডিগ্রী সমাপ্ত করেন এবং একই বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জন করেন। প্রফেসর ড. বেনেডিক্ট গমেজ খ্রিস্টিয় মূল্যবোধ বজায় রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুনামের সাথে শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর মধ্যে স্বদেশপ্রেম, ছাত্রদের প্রতি অকৃত্তিম ভালবাসা থাকার কারণে অবাধ সুযোগ থাকা সত্যেও তিনি বাংলাদেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমান নি।

এরকম আরো উদাহরণ আছে। বাংলাদেশ সরকারের সুবিধা নিয়ে খ্রিস্টান শিক্ষক, গবেষক, সরকারী কর্মকর্তা বিদেশ থেকে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করে দেশে ফিরে এসে কর্মস্থলে যোগদান করে দেশ ও জনগণের সেবা করে গেছেন/যাচ্ছেন। উপসচিব মুক্তিযোদ্ধা উইলিয়াম গমেজ, প্রফেসর ড. ডোনাল্ড জেমস গমেজ, ড. ইসিদোর গমেজ, যুগ্ম-সচিব (মহাপরিচালক) প্রয়াত উইলফ্রেড রড্রিক্সস, যুগ্ম সচিব জেমস হিলটন, অতিরিক্ত সচিব দিলীপ পিউস কস্তা, অতিরিক্ত সচিব বীর মুক্তিযেদ্ধা উইলিয়াম অতুল কুলুনতুনু, অতিরিক্ত সচিব অমৃত বাড়ৈ, সচিব নমিতা হালদার, চীফ ইঞ্জিনিয়ার এডুয়ার্ড গমেজসহ আরো অনেকে। এদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের লিখনীর মাধ্যমে প্রমান করেছেন, (অমৃত বাড়ৈ, উইলিয়াম অতুল) তাদের স্বদেশ প্রেম ও মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ কত গভীর।

০৪. জাতীয় বিভিন্ন দুর্যোগে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ঃ ১৯৭০ সনের প্রলয়ংকরী জলোচ্ছাসে বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে কয়েক লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়, লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে এবং না খেয়ে মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। সময়টা তখন পাকিস্তান আমল। সরকারী সাহায্য সহযোগিতার জন্য অপেক্ষা না করে বাংলাদেশের খ্রিস্টান মিশনারী, স্কুল কলেজের ছাত্র-শিক্ষকগণ ছুটে গিয়েছিলেন দুর্গত এলাকায়। এর মধ্যে ঢাকার নটরডেম কলেজের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খ্রিস্টান এনজিওগুলো পরবর্তীতে ব্যপক পুনর্বাসন কাজ করেছে। এভাবে সবসময় ছোট বড় যে কোন জাতীয় বা স্থানীয় দুর্যোগ দুর্ঘটনায় খ্রিস্টানগণ মানুষের পাশে থেকে দেশপ্রেমের স্বাক্ষর রেখে চলছে।

০৫. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এদেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায় স্বদেশেপ্রেমের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছে। ১৯৭১ সনের ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দান থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। তার আহবানে সাড়া দিয়ে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্র ও যুবকরা উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। অথচ, খ্রিস্টানদের মধ্যে খুব নগন্য সংখ্যক ব্যক্তি/মানুষ রাজনৈতিক দলে থেকে মাঠের রাজনীতি করতেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে শুধু সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়েনি খ্রিস্টান যুবক-তরুণরা, তাদের পিতা-মাতা এমনকি চার্চের পুরোহিতগণ ও সিষ্টারগণ বিভিন্নভাবে মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করেছেন। ভাওয়াল এলাকার কয়েকটি গ্রামকে নিঃসন্দেহে মুক্তিযোদ্ধা গ্রাম বলে অভিহিত করা যায়। বিশেষভাবে ভাওয়াল এলাকার রাঙ্গামাটিয়া, নলছাটা, দড়িপাড়া, ধনুন, মাউসাইদ আঠারগ্রাম এলাকার সোনাবাজু, বক্সনগর, হাসনাবাদ, নয়নশ্রী, গোল্লাসহ আরও কতগুলো খ্রিস্টান গ্রাম। আমার ধারনা বাংলাদেশের কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকা থেকে এত অধিক সংখ্যক অরাজনৈতিক ছাত্র-যুবক মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। এদের বেশীরভাগই ছিলেন খ্রিস্টান। এলাকার প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত বিশিষ্ট কয়েকজন খ্রিষ্টান মুক্তিযোদ্ধার নাম উল্লেখ না করলেই নয়, যাদেরকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। এরা হলেন, শান্ত বেঞ্জামিন ডি' রোজারিও, এন্ড্রু ডি' কস্তা, কিরন প্যাট্রিক ডি' রোজারিও, ফাদার ইগ্নেশিউস গমেজ, ফাদার জেমস কিরন রোজারিও, প্যাট্রিক রড্রিগস, সমর লুইস কস্তা, সন্তোষ রড্রিগস, হিউবার্ট সন্তোস কস্তা, এলবার্ট পি. কস্তা ; আঠারগ্রাম অঞ্চেলের মি. উইলিয়াম গমেজ, ড. ডেভিড হেনরী মজুমদার, এডুয়ার্ড কর্নেলিয়াস গমেজ, হিউবার্ট অনিল গমেজ, নির্মল গমেজ, জোনাস গমেজ, মুকুল রিচার্ড গমেজ, ফিলিপ বাদল কোড়াইয়া; ময়মনসিংহের ডাঃ উইলিয়াম স্রং ও থিওফিল হাজং, দিনাজপুরের জর্জ দাস ভ্রাতৃত্রয়, ভবেরপাড়া মিশনের এক্স সেমিনারিয়ান স্টিফেন পিন্টু বিশ্বাস (১৭ই এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত পরিবেশক ও বাইবেল পাঠক)। পিন্টু বিশ্বাস কোন রাজনীতি করতেন না। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৭ই এপ্রিল পূর্ব রাতে স্থানীয় সংগ্রাম

কমিটির কর্মীদের সঙ্গে সারারাত শপথ গ্রহণের জন্য মঞ্চ নির্মাণে নেতৃত্ব দিয়েছেন, মিশন স্কুল ও গীর্জা থেকে টেবিল, চেয়ার ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়েছেন। এমনকি জাতীয় সংগীতের জন্য হারমোনিয়াম ও বাইবেল নিয়েছিলেন মিশন থেকে। তার সাথে ফাদার সিস্টারগণও সহযোগিতা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় স্টিফেন পিন্টু বিশ্বাস বর্ডার এলাকায় মিশনারীজ অফ চ্যারিটির সিস্টারদের সাথে থেকে আহত মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থী মানুষের সেবায় কাজ করেছেন। সবই তিনি করেছেন সহজাত স্বদেশপ্রেম থেকে।

চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে। তিনি আগরতলাতে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসাবে মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। এরকম আরও বহু খ্রিষ্টান ছাত্র-যুবক স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বদেশ প্রেমের স্বাক্ষর রেখেছেন। বাংলাদেশের সব এলাকার খ্রিষ্টানগণ, বাঙ্গালী, গারো, সাওতাল, উড়াও, পাহাড়ী সবাই মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে অন্যত্র বিস্তারিত জানা যাবে। ভাবতে বুক ভরে যায়, বাংলাদেশে একজনও খ্রিষ্টান রাজাকার ছিল না।

বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদে খ্রিস্টান যুব-ছাত্র : ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি ক্ষমতা দখল করলে বঙ্গবন্ধুর পক্ষের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিশেহারা হয়ে পড়ে। তখন ময়মনসিংহ গারো অঞ্চলের খ্রিস্টান যুবক-ছাত্র জনগণ যারা মুক্তিযুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিল, তাদের অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধা জাতির পিতার হত্যাকারী মোশতাক সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ ঘোষণা করে সীমান্ত এলাকায় সশস্ত্র সংগ্রাম করে স্বদেশ প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছে। উক্ত এলাকার বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা বজলুর রহমানের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী এক-দেড় হাজার প্রতিরোধ যোদ্ধাদের অধিকাংশই ছিলেন গারো খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের। তাদের মধ্যে প্রতিরোধ কমান্ডার নিরেন পিটার হাগিদক সাংমা (মি. মৃগেন হাগিদকের বড় ভাই), রবার্ট রংদি, এমেনড্রো স্নাল, মাখন চিসিম, সুধীর চন্দ্র রায় (হাজং), অগ্নী হাজং, বিশ্বেশর বানাই, পংকজ আজিম, জর্জ গনত্ মানখিন, উল্লেখযোগ্য। প্রায় দুই বছর তারা যুদ্ধ করেছেন। এতে অনেক খ্রিষ্টান যুবক নিহত ও আহত হয়েছে। ভারতে রাজনৈতিক সরকার পরিবর্তন হলে এই অসীম সাহসী প্রতিরোধ যোদ্ধাদের বাংলাদেশ সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। আমার মনে আছে, ঐ দেশপ্রেমিক যোদ্ধাদের প্রায় এক বছর ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলার কলাকোপা নামক স্থানে ইছামতি নদীর ধারে একটি প্রাসাদোপম বাড়িতে আটক রাখা হয়েছিল। পরে তারা মুক্তি পায়। এদের কেউ কেউ ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন, অনেকে দুঃখ-কষ্টে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। দুঃখের বিষয় স্বদেশপ্রেমী এই প্রতিরোধ মুক্তিযোদ্ধাদের বেশীরভাগই এখনও মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পায়নি।

০৬. খ্রিস্টান মিশনারী স্কুল, কলেজের শিক্ষার বিশেষত্বঃ বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারী স্কুলগুলোয় এ্যসেম্বলীতে নিয়মিত জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কক্ষে প্রবেশ করানো হয়। নির্ধারিত পাঠ্যক্রমের বাইরে শিশু-কিশোরদের শেখানো হয়, নিয়মানুবর্তিতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পরস্পরের প্রতি সম্মান, বিভিন্ন মানবিক গুণাবলীসহ দেশপ্রেম। এভাবে এদেশের খ্রিস্টানগণ শৈশবকাল থেকেই স্বদেশপ্রেমী হয়ে ওঠে। পারিবারিক পরিমন্ডলেও শিশু-কিশোররা উল্লিখিত গুণাবলী চর্চা করার জন্য পরিবেশ পেয়ে সৎ ও নীতিবান নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে।

০৭. সামাজিক সচেতনতা ও পারস্পরিক সহায়তাঃ বাংলাদেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায় দেশপ্রেমিক। কারণ তারা সমাজ ও জাতি গঠনে আন্তরিকভাবে কাজ করে। খুব কম সংখ্যক খ্রিস্টান সক্রিয় রাজনীতি করলেও, সমষ্টিগতভাবে তারা রাজনীতি ও সমাজ সচেতন। সমাজে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে খ্রিস্টানগণ মানুষের মানবিক ও আর্থিক উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। আমাদের সমাজ কোন না কোনভাবে চার্চ কেন্দ্রিক হওয়ার কারণে সামাজিকভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা মোকাবেলা করে সমাধানের চেষ্টা করে। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন, রাস্তা ঘাটে কোন খ্রিস্টান ভিক্ষুক দেখা যায় না। তাই বলে কি, খ্রিস্টানদের মধ্যে দরিদ্র ও অসহায় পরিবার নেই! প্রতিটি খ্রিস্টান গ্রামে এরকম অনেক মানুষ বা পরিবার আছে। খ্রিস্টান সমাজে এবং চার্চের অধীনে কিছু সংস্থা বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আছে তাদেরকে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়। সেন্ট ভিনসেন্ট দা পল সোসাইটি নামের একটি সংস্থায় আমরা নিয়মিত দান করে তহবিল গঠন করি। এছাড়া "মুষ্ঠি চাল" বলে একটি পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজভুক্ত পরিবার থেকে মাসিক ভিত্তিতে চাল সংগ্রহ করা হয়। এই চাল একটি নির্দিষ্ট স্থানে জমা করে অভাবগ্রস্ত পরিবারগুলোতে ভাতের যোগান দেয়া হয়। ফলে কাউকে আর রাস্তায় ভিক্ষা করতে হয় না। আমাদের প্রতিটি খ্রিস্টান ধর্মপল্লী/চার্চের অধীনস্ত প্রায় সকল পরিবারের একটি পরিসংখ্যান/তালিকা থাকে, তাই সাহায্য প্রদানে অসুবিধা হয় না।

০৯. স্বদেশপ্রেম থাকা মানুষ কখনও তার দেশের প্রকৃতি, পরিবেশ ও সরকারী সম্পত্তি নষ্টকারী কোন কাজ করতে পারে না। এগুলো খ্রিস্টানদের স্কুলে, গীর্জায় ও পরিবারে শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে দায়িত্বশীল করে তোলে। খ্রিস্টানগণ সাধারণত অপচয় করে না, নিজেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থেকে অন্যদের উৎসাহিত করে। খ্রিষ্টানদের সম্ভবত এমন কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না যে, বাংলাদেশে চাকুরি করে সন্তান-পরিবার অন্য দেশে রেখে উপার্জনের টাকা সেদেশে সঞ্চয় করছে।

১০. খ্রিষ্টানদের উপাসনা পদ্ধতির বিশেষত্ব হলো চার্চে (গীর্জায়) বা উপাসনা গৃহে নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ একসাথে